নতুন বাসায়

সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

নবভারতী
৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট :: কলিকাতা—১২

প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৫৫

প্রকাশক

সুনীল দাশগুপ্ত

নবভারতী

৮, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

মুদ্রাকর

শ্রীশরৎ চন্দ্র দাস, বি, এ,

মডার্ণ প্রিন্টিং সার্ভিস্

কলিকাতা—১২

প্রচ্ছদপট

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

পাকিস্তান প্রাপ্তিস্থান

বইঘর

চট্টগ্রাম।

দুই টাকা আট আনা

রুণু ঝর্ণা পুসিকে—

এই লেখকের অন্যান্য বই

অন্য নগর (২য় সংস্করণ)

এই মর্তভূমি (২য় সংস্করণ)

দূরের মিছিল (২য় সংস্করণ)

মনে মনে (২য় সংস্করণ)

মুখর লণ্ডন (২য় সংস্করণ)

ছায়া মারীচ (২য় সংস্করণ)

ইভনিং ইন্ প্যারিস (যন্ত্রস্থ)

ব্যালেরিণা (”)

জন সম্রাট (”)

ন তু ন বা স র

নতুন বাসর

বছরে একবার !

তারপর সাতকড়ির আর পাঁজি না দেখলেও চলে। দিনক্ষণ ওর একেবারে মুখস্থ হ'য়ে যায়। গড়গড় করে ও ব'লে যেতে পারে কোনদিন শুভ আর লগ্ন কতক্ষণ থাকবে। আগে কখনও কখনও তার ভুল হ'তো কিন্তু এখন অভ্যাস হ'য়ে গেছে। এমন কি, পাঁজির ভাষাও কথায় কথায় উল্লেখ করতে পারে। কখনও ওর বাধে না, একটুও আটকায় না।

বৈশাখের প্রথম থেকেই প্রাণময় ব্যস্ততায় সাতকড়ি চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। খুশির তীব্র আভা বিদ্যুতের মতো ওর মুখে চমক মারে। কথায় কথায় চটি পায়ে দিয়ে, চাদর জড়িয়ে লাঠি হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। নাওয়া খাওয়া ভালো ক'রে করবার সময়ও পায় না। তারপর সপরিবারে নেমন্তন্ন খেয়ে বেড়ায়। স্ত্রী আর মেয়ের জন্যে অনেক উপহার পায়। খুশির চাপে বৈশাখ মাস কেটে যায়।

জ্যৈষ্ঠের প্রথম থেকেই সাতকড়ি একটু মন মরা হয়ে থাকে। কখনও কাজের চাপে চঞ্চল হয়, আবার কখনও হাঁসফাঁস করতে করতে অলস মধ্যাহ্ন অতিবাহিত করে। থেকে থেকে বিরক্ত হ'য়ে বলে ওঠে, কী গরম, আর পারি না বাপু! বেশ বোঝা যায় সাতকড়ির মন বিশেষ প্রসন্ন নয়।

তারপর আষাঢ় আসে। মেঘে মেঘে আকাশ ছেয়ে যায়। বর্ষার ধারায় ময়ূরের মতো সাতকড়ির মন নেচে ওঠে। ছাতা ঘাড়ে ক'রে আবার ও ছুটোছুটি করে।

শ্রাবণ শেষ হওয়ার সংগে সংগে সাতকড়ি ক্ষেপে ওঠে। ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক—এই তিনটি মাস তাকে যেন অলস ক'রে রাখে। অকারণ সে খিটখিটে হ'য়ে ওঠে, মেয়েকে বকাবকি করে, কথায় কথায় স্ত্রীর সংগে ঝগড়া বাধায়। এ ক'মাস ওকে ব'সে থাকতে হয়। সারা বছরের মধ্যে এই তিনটি মাস তাকে বড়ো বেশি পীড়া দেয়।

তারপর অগ্রহায়ণ এসে পড়ে। দেখতে দেখতে মাঘ ফাল্গুনও দেখা দেয়। সাতকড়ি খুশি হয়।

সুযোগ বুঝে একদিন সৌদামিনী বললো, বলি তোমার ব্যাপারখানা কি? নিজের ঘরের দিকে কি চোখ মেলে চাইবে না?

বিস্মিত হ'য়ে সাতকড়ি জিজ্ঞেস করলো, কেন, কি হ'ল আবার?

সে কথাও মুখ ফুটে বলতে হবে? সৌদামিনী রাগের ভান করলো, মেয়েটাকে আর কতকাল ঘরে রাখবে? বিয়ের বয়স যে ওর বহুদিন পেরিয়ে গেছে সে খেয়াল আছে তোমার?

ও, একটু হেসে সাতকড়ি বললো, লক্ষ্মীর বিয়ের কথা বলছো? এই দেবো এবার—

অনেকদিন থেকেই তো আশা দিয়ে আসছো, কিন্তু দোহাই তোমার, দেরি ক'র না—

না না, আমি খুব চেষ্টা করছি, একটা পাত্র পেলেই—

পরের মেয়ের জন্যে এত পাত্র পাচ্ছো আর নিজের মেয়ের কথা মনে থাকে না?

থাকে গো গিন্নী, খুব মনে থাকে, সাতকড়ি মৃদু হেসে হুঁকোতে দীর্ঘ টান মারলো।

আসলে সাতকড়ি নিজের মেয়ের বিয়ের কথা ভাববারই অবসর পায় না। ও পরের মেয়েদের আগে পার ক'রে দিতে চায়। অত টাকা কোথায় তার! তাই লক্ষ্মীর বিয়ের জন্যে সাতকড়ি বড় একটা ব্যস্ত হয় না। আর এমন কিইবা বয়স হয়েছে লক্ষ্মীর!

বলতে গেলে লক্ষ্মী আজকাল বিয়ের আশা ছেড়েই দিয়েছে। মা, বাবার আলোচনা শুনে সে বুঝতে পেরেছে যে তার বিয়ে শিগগির হবে না। বাবা ভুলেও চেষ্টা করবেন না। সাতকড়ির সে স্বভাবই নয়।

কিন্তু এ বাড়িতে থাকতে লক্ষ্মীর আর ইচ্ছে করে না। তার অস্বস্তি বোধ হয়, দম বন্ধ হ'য়ে আসে। ছোট্ট একতালা ভাড়া বাড়ি, ম্লান দু'টো ঘর, তক্তপোষগুলো অপরিষ্কার। আলোর বন্যায় ঘর ভ'রে যায় না, বাতাসের উচ্ছলতা নেশা জাগায় না। তার হাঁফ ধরে যায়। ছুটে বাইরে যেতে ইচ্ছে করে।

হয়তো এতো কথা লক্ষ্মীর মনে আসতো না। এ দু'টো ছোট্ট ম্লান ঘরেই আনন্দে সমস্ত জীবনটাই সে কাটিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু মাঝে মাঝে স্বপ্নের মতো অনেক রাত এসে পড়ে!

বড়ো বড়ো বিয়ে বাড়িতে প্রায়ই তো ওদের নেমন্তন্ন হয়। কতো বিয়ে তো সাতকড়িই দেয়! বিয়ে বাড়ির সেইসব রাজকীয় দৃশ্যের কথা লক্ষ্মী কিছুতেই ভুলতে পারে না। ও যেন মেতে ওঠে। ক'নের সুন্দর সাজ-পোষাক দেখে তার হিংসে হয়। কতো লোকজন চারপাশে! কতো আলো! রানীর মতো মনে হয় ক'নেকে। সাজালে তাকে ওর চেয়েও ভালো দেখাবে। এইসব ভেবে মুগ্ধ হ'য়ে লক্ষ্মী দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর খাওয়ার পালা! প্রচুর আহার করে ও। আহা, খেতেও এতো আনন্দ! চারপাশের ঐশ্বর্যের ছটায় ওর চোখ ঝলসে যায়। স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে যেন সময় কাটে!

তারপর আবার সেই ছোট্ট ঘরের নোংরা তক্তপোষ! লক্ষ্মীর ভালো লাগে না।

এ বাড়ি থেকে ও বেরিয়ে যেতে চায়। কেবলই শোন, নেই নেই, ভালো কাপড় নেই, খোকার দুধ নেই, একটাও চাকর নেই, ইচ্ছে মতো খরচ করবার মতো পয়সা তো নেই-ই। অতি সন্তর্পণে টিপে চলতে হয়। একটু এদিক ওদিক হ'লে খাওয়া জুটবে না। অমন খাওয়া খেতে চায়ও না লক্ষ্মী। খেতে ব'সে ওর গা গুলিয়ে ওঠে। শাক আর কুচো চিংড়ি খেতে খেতে জিব পচে গেলো—এর কোন পরিবর্তন নেই। জন্ম থেকেই চারপাশে দেখো দারিদ্র্যের ছায়া। গরিব—এই কথাটা ভাবতে কি জানি কেন লক্ষ্মীর মাথা কাটা যায়। এ বাড়ি থেকে তাই ও বেরিয়ে যেতে চায়। এমন বর ও চায় যে ওকে অসংখ্য আলোর মাঝ দিয়ে ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে এনে ফেলবে।

কাজ না থাকলেও অনেক সময় সাতকড়ি কাজ সৃষ্টি ক'রে নেয়। অকারণেই লোকের বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হয়। পাড়ার ছেলে-মেয়েদের বয়স হলেই সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পরিচয় না থাকলেও লোকের সংগে আলাপ জমিয়ে নিতেও অদ্বিতীয়।

আসলে শুধু লক্ষ্মীর নয়, দারিদ্র সাতকড়িরও অসহ্য। সে কিছুতেই বুঝতে পারে না প্রাণপণ পরিশ্রম ক'রেও কেন তার অভাব যায় না, কেন ছেলেমেয়েরা ভালো খেতে পায় না, লক্ষ্মীর বিয়ের টাকাটাই বা জমে না কেন, কেন সৌদামিনী প্রতিদিন অসহিষ্ণু হ'য়ে ওঠে। সাতকড়ি কিছুই ভেবে পায় না। সে শুধু কাজই ক'রে যায়, আর ভাববারও সময় পায় না। আজকাল ও যন্ত্রের মতো হ'য়ে গেছে। শুধু কাজ আর কাজ, কোনদিকে চোখ দেবার সময় তার নেই।

ভালো কথা, পাড়ার কোন লোককে একদিন সাতকড়ি ধ'রে বস্‌লো, আর দেরি ক'র না, সব দিক দিয়ে ওটা খারাপ, ছেলের বিয়ে দিয়ে ফেল এইবার—

ইচ্ছে তো আছে দাদা, একটা পাত্রী দাওনা দেখেশুনে—

বেশ তো, বেশ তো, শিগগিরই ভালো পাত্রী এনে দেবো তোমার ছেলের জন্যে।

সত্যি অবশেষে একদিন বিয়ে হ'য়ে গেলো। সাতকড়ির এই দ্রুততায় পাত্রের পিতা মুগ্ধ হ'লো। আরো অনেকে এলো পরামর্শ করতে।

পাড়ার প্রত্যেকের কাছে সাতকড়ি সুপরিচিত। অন্য কোন ঘটক ওর মতো অতো তাড়াতাড়ি সম্বন্ধ ক'রে দিতে পারে না। আর ওর সম্বন্ধগুলো হয়ও চমৎকার। অনেকের কথা ভেবে সত্যিই অনেক সময় ওর ঘুম হয় না। প্রত্যেকের জন্যে যেন তারই গরজ বেশি।

দেখুন, হঠাৎ একদিন সকালবেলা কারুর বাড়িতে গিয়ে সাতকড়ি বলে বসলো, খুব ভালো একটা পাত্র আছে, যদি আপনার মেয়ে—

আমার মেয়ের বিয়ের কথা আমি ভাববো মশাই—

সে তো ঠিকই, তবে কি জানেন, সন্ধানে যখন রয়েছে ভালো পাত্র—

ভদ্রলোক ক্ষেপে উঠলেন, আপনার কাছে যে-পাত্র ভালো, আমার কাছে তার দাম হয় তো এক পয়সাও নয়, বুঝলেন মশাই? বিরক্ত করবেন না, যান—

মাথা চুলকোতে চুলকোতে সাতকড়ি বেরিয়ে এলো। অনেক সময় আরো অনেক রকম অপমান তাকে সইতে হয়। কিন্তু ভুলেও সাতকড়ি কখনো সে সব গায়ে মাখে না। আসলে এসব কথা ওর মনেই থাকে না।

কখনো কখনো সাতকড়ির নীরস জীবনেও অনেক মজার ব্যাপার ঘটে। সেইসব কথা মনে ক'রে একা একা হেসে অস্থির হয় সে।

হয় তো বিয়ের সব ঠিকঠাক। কর্তার সংগে কথা-বার্তা পাকা ক'রে হন্ হন্ ক'রে সাতকড়ি বেরিয়ে আসছে—এমন সময় কানে এলো ঘটকমশাই শুনছেন ? মেয়ের কণ্ঠস্বর শুনে ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। দ্রুতপদক্ষেপে একটি মেয়ে এগিয়ে এলো। আরে, এই তো পাত্রী! সন্ধ্যার অন্ধকারেও সাতকড়ির চিনতে দেরি হ'ল না।

কি মা, কিছু বলবে ?

হ্যাঁ, মানে—

বল।

এ বিয়ে ভেঙে দিন আপনি!

কি বলছো মা! সাতকড়ি যেন কথাটা বিশ্বাস করতে পারলো না।

এ বিয়ে আমি ক'রতে পারবো না। আপনি দয়া ক'রে এগোবেন না।

পাত্র পছন্দ হয়নি বুঝি ? সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞেস করলো সাতকড়ি।

না না, তা' নয়, মানে—

আমি বলছি মা, সাতকড়ি ব'লে চললো, এ-ঘরে বিয়ে করলে সুখী হবে, খুব ভালো ছেলে, বড়ো ঘর—

না না, ব্যাকুলকণ্ঠে মেয়েটি ব'লে উঠলো, আমি বিয়ে ক'রতে পারবো না।

বিয়ে না করলে কি মেয়েমানুষের চলে ? ছেলেমানুষী ক'র না মা, একটু বুঝে দেখ—কেন অমন করছো ?

না না, মেয়েটির কণ্ঠে কান্না কাঁপতে লাগলো, সব কথা আপনাকে বলতে পারবো না, কিন্তু কিছুতেই আমি বিয়ে ক'রবো না!

সাতকড়ি একটু চুপ ক'রে রইলো। হঠাৎ কি যেন বুঝতে পারলো ও। তারপর বললো, অন্য কারুর সঙ্গে বুঝি—

মেয়েটি লজ্জায় মাথা নিচু করলো।

তাই তো সাতকড়ি ভাবতে লাগলো কি বলা যায়, দেখ মা, বাপ মা দিচ্ছে

ঠিক ক'রে, কতো বেশি বোঝেন তারা! আর আমি বলছি বড়ো ভালো ছেলে, তোমার খুব পছন্দ হবে—

আপনাকে সোনার বালা খুলে দিচ্ছি, মেয়েটি সত্যি বালা খুলতে গেলো।

আ হা হা, কি যে কর মা? ছি ছি—

আপনি কথা দিন আমায়?

বড়ো মুশকিলে পড়লাম দেখছি, চিন্তিত মুখে সাতকড়ি বেরিয়ে এলো।

বলা বাহুল্য এ বিয়ে ভেঙে গেলো। কন্যা-কর্তাকে অবাক ক'রে দিয়ে সাতকড়ি উধাও হ'লো। মেয়েটি মনে মনে ঘটককে অজস্র ধন্যবাদ দিলো।

এমনি আরো কতো যে ঘটনা ঘটে সাতকড়ির জীবনে!

একদিন সন্ধ্যার অন্ধকার বেশ ঘন হ'য়ে উঠেছে। কৃষ্ণপক্ষের গম্ভীর অন্ধকার। ভালো ক'রে পথ চেনা যায় না। সাতকড়ি কি যেন ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরছিল। সারাদিন বড়ো পরিশ্রমের ভেতর দিয়ে কেটেছে আজ, খাওয়ার সময় হয়নি। আজ ও বড়ো ক্লান্ত।

এই মশাই দাঁড়ান! গম্ভীর কর্কশ কণ্ঠস্বরে সাতকড়ি চমকে উঠলো। তার সামনে চার-পাঁচজন লোক হাত গুটিয়ে এসে দাঁড়ালো।

আপনারা? ভয়ে সাতকড়ির সমস্ত শরীর হিম হয়ে গেলো।

শুনুন, একজন এগিয়ে এসে বললো, মৈত্র মশাইর মেয়ের বিয়ের ঠিক করবেন কি মাথা গুঁড়িয়ে দেব আপনার—বুঝেছেন?

আচ্ছা, বাবা আচ্ছা—

ঠিক বলছেন?

হ্যাঁ বাবা, ঠিক বলছি!

মৈত্র মশাইর বাড়ির রাস্তা দিয়ে যেন আর কখনো আপনাকে হাঁটতে না দেখি।

আচ্ছা, আচ্ছা—

মনে থাকবে?

হ্যাঁ বাবা, খুব মনে থাকবে, ওদের হাত এড়িয়ে হন্ হন্ ক'রে সাতকড়ি পথ চলতে লাগলো। বাবা, এ যে নভেলি ব্যাপার!

সুযোগ বুঝে সৌদামিনী আবার সাতকড়িকে ধরলো।

বলি, তুমি কি লক্ষ্মীর দিকে কিছুতেই চোখ তুলে চাইবে না?

সাতকড়ি অবাক হ'য়ে বললো, কি হ'ল লক্ষ্মীর?

ছি ছি, লজ্জাও করে না অমন অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস করতে?

ও, সাতকড়ি এবার হেসে ফেললো, লক্ষ্মীর বিয়ের কথা বলছো? এই তো—এই—মানে, সব ঠিক ক'রে ফেলবো আমি এইবার, কিচ্ছু ভাবতে হবে না তোমায়!

থাক, সৌদামিনীর সমস্ত রক্ত যেন মুখে জমা হ'ল, ওকথা অনেকবার শুনিয়েছো আমায়, কিন্তু তোমার আর কি? বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াও তোমায় তো আর কথা শুনতে হয় না, ওদিকে আমার প্রাণ যে গেল, পাঁচজন আত্মীয় তো আমাকেই বলে!

আহা হা, আর কিচ্ছু ব'লতে পারবে না তারা তোমায়! এই—এটাতো বৈশাখ মাস, দেখ না দু'একদিনের মধ্যেই লক্ষ্মীকে পার ক'রে দেবো।

তোমার সংগে আমি তর্ক করতে চাই না, কথায় তোমার সংগে তো আর পারা যায় না কিন্তু বলি, মুখে জগৎ মাৎ ক'রে আর কতোদিন চলবে? কেমন বাপ গো তুমি, মেয়েটার জন্যে কি একটু ভাবনাও হয় না?

বাঃ, ভাবনা হয় না? তা যদি না হবে তো বৈশাখ মাসের মধ্যে লক্ষ্মীকে পার করবো কেমন ক'রে?

থাক থাক, ওকথা তোমার মুখে মানায় না।

দেখে নিও গিন্নী, দেখে নিও!

দু' বচ্ছর ধ'রে দেখছি, দুম দুম ক'রে পা ফেলে সৌদামিনী বেরিয়ে গেলো।

মৃদু হেসে সাতকড়ি পাঁজিটা টেনে নিলো। এখুনি ও দিনস্থির ক'রে ফেলবে, যেমন ক'রে হোক এমাসের মধ্যে ও লক্ষ্মীর বিয়ে দেবেই। সত্যি ওকে আর ফেলে রাখা যায় না। এতোদিন পর সাতকড়ির সারা মুখে চিন্তার রেখা স্ফীত হ'য়ে উঠলো।

গ্রীষ্মের প্রখর মধ্যাহ্নে পথ চলতে চলতে সাতকড়ির সারা অংগ জ্বলে

যায় তবু ও ক্লান্ত হয় না। লক্ষ্মীর বিয়ে দিতেই হবে। এত পাত্র জুটিয়ে দিয়েছে সে কিন্তু যে তার সব চেয়ে আপনার সেই লক্ষ্মীর বেলা কেন তাকে বারে বারে এমন ক'রে ব্যর্থ হতে হচ্ছে। সত্যি কথা খুব বেশি টাকা সাতকড়ি দিতে পারবে না—কিন্তু গুণে লক্ষ্মী কার চেয়ে কম!

রাত্রে সাতকড়ির ভালো ঘুম হয় না আর আজকাল। দিনের বেলা উন্মাদের মতো সে পাত্রের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। অনেকদিন অবহেলায় কেটে গেছে আর নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে থাকা চলে না। সাতকড়ি খাওয়া-দাওয়া ভুলেছে, বিশ্রাম ভুলেছে, কাজ ভুলেছে। কঠিন শপথের মতো শুধু লক্ষ্মীর সম্বন্ধের কথা বাসা বেঁধেছে ওর মাথায়। এ পরিশ্রমের মূল্য যেমন ক'রে হোক ওকে পেতেই হবে।

যাহোক প্রাণপাত পরিশ্রম ক'রে সাতকড়ি একদিন পাত্রের সন্ধান পেলো। ছেলেটি ভালোই। ম্যাট্রিক পাশ। ব্যাঙ্কে পাকা চাকরি করে। তারওপর একমাত্র ছেলে। বাপও ভালো মানুষ। মোট কথা, তারককে সাতকড়ির খুবই ভালো লাগলো।

প্রথমে সৌদামিনীকে সে একটি কথাও জানালো না। আগে কথা একেবারে পাকা হ'য়ে যাক, তারপর মেয়ে দেখানোর দিন সব বললেই হবে। সৌদামিনীকে সাতকড়ি একেবারে আশ্চর্য ক'রে দেবে।

উপেনবাবুর সংগে কথাবার্তা প্রায় পাকা হ'য়ে গেলো।

এবার একদিন মেয়ে দেখে আসুন দয়া ক'রে!

বেশ তো, শিগগিরই যাওয়া যাবে, উপেনবাবু আস্তে আস্তে বললেন, জানেন ঘটক মশাই, বিয়েটা বৈশাখের মধ্যে চুকিয়ে ফেলা আমার খুব ইচ্ছে—

আরে, আমারও তো তাই ইচ্ছে, এখন মেয়ে পছন্দ হ'লেই হয়, তবে কি জানেন, একটা কথা বলি, মেয়ে আপনার পছন্দ হবেই, নাম তার লক্ষ্মী আর রূপে গুণে সব দিক দিয়েই একেবারে লক্ষ্মী!

তাহ'লে আর দেখবার দরকার কি? উপেনবাবু জোরে হেসে উঠলেন।

আর দেখুন সাতকড়ি স্পষ্টই বললো, গরিব মানুষ আমি, ছেলের যোগ্য মূল্য দেয়া আমার—

কি যে বলেন ঘটক মশাই, বাধা দিয়ে উপেনবাবু ব'লে উঠলেন, একি

বেচাকেনার ব্যাপার? এসব বললে আমি বড়ো লজ্জা পাই। টাকার কথাই ওঠে না এখানে।

সাতকড়ি ভারি খুশি হোলো। এমন লোকের দেখা মেলাও শক্ত আজকাল।

তাহ'লে কবে দেখতে যাবেন বলুন?

বেশ তো, কালই যাওয়া যাবে।

হ্যাঁ, সেই ভালো, শুভস্য শীঘ্রম্, সাতকড়ি উঠে দাঁড়ালো।

সৌদামিনী যেন কিছুতেই কথাটা বিশ্বাস করতে পারছিল না। চোখ বড়ো ক'রে স্বামীকে সে শুধু জিগ্যেস করলো, সত্যি বলছো?

হুঁ হুঁ, গম্ভীরভাবে সাতকড়ি মাথা নেড়ে বললো, বলেছিলাম না বৈশাখ মাসের মধ্যে পাত্র হাজির করবো—এখন হ'লো তো?

কই আমাকে তো আগে কিছু বলো নি?

আগে ব'লে মরি আর কি, দিনরাত তো পেছনে লেগেই আছো, আগে ব'লে একটু এদিক-ওদিক হ'লেই—তখন পালাতাম কোথায় গিন্নী?

সে কি গো তাহ'লে সত্যি?

হ্যাঁ গো হ্যাঁ, কালই তারা দেখতে আসছে। বেশ ক'রে সাজিয়ে বের ক'রো লক্ষ্মীকে। ভালো শাড়ি-টাড়ি আছে তো? যদি না থাকে তাহ'লে আজকের মধ্যে চেয়ে-চিন্তে যোগাড় ক'রে রেখো—

তারা ঠিক আসবে তো?

আসবে মানে? সাতকড়ি এবার অবাক হ'লো, শুনছো বিয়ে দেবে বৈশাখের মধ্যে—তুমি যেন কী! দাও দেখি এখন, খুব কড়া ক'রে এক ছিলিম তামাক সেজে।

যথাসময়ে লক্ষ্মীর কানে গেলো সব। আর সে রাত্রে কিছুতেই তার ঘুম এলো না। অসহ আবেশে তার সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ ক'রতে লাগলো। কেমন দেখতে হবে তার বর! কল্পনায় রঙীন হ'লো লক্ষ্মীর রাত! শিহরণের ঢেউ বারবার তাকে কাঁপিয়ে গেল!

পরদিন সত্যি লক্ষ্মীকে তারা দেখে গেলো। খুব বেশি পছন্দ হ'লো তাদের। সাতকড়ি এর জন্যে প্রস্তুত ছিলো, সে মোটেই আশ্চর্য হ'লো না। সৌদামিনী আনন্দে কি করবে ভেবে না পেয়ে সাতকড়িকে হঠাৎ ঢিপ্ ক'রে প্রণাম ক'রে ফেললো। আর লক্ষ্মী? সে শুধু ভাবছিলো সেদিনের কথা, যেদিন অসংখ্য আলো আর কোলাহলের মাঝে তাকে রানীর মতো দেখাবে।

দেখতে দেখতে বাড়ির হাওয়া ঘুরে গেলো। ব্যস্ততার সাড়ায় চারপাশ মুখরিত হ'য়ে উঠলো। কারুর যেন নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। দশদিনের মধ্যে বিয়ে দিতে হবে। মাঝে মাঝে সাতকড়িকে একটু চিন্তিত দেখায় যেন। টাকার ভাবনা তাকে বড়ো বেশি পীড়িত করে। তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়বে! সৌদামিনীর ওসব ভাবনা নেই, লম্বা সাদা কাগজে সে শুধু ফর্দ ক'রে যাচ্ছে। চাঞ্চল্য আর ব্যস্ততার মাঝে কয়েকদিন কেটে গেলো। প্রায় সব কিছুই ঠিক হ'য়ে এলো।

বিয়ের খবর ছড়িয়ে পড়লো আত্মীয়-মহলে। বালিশ বিছানা নিয়ে দু'একজন এসে উপস্থিত হ'লো। আয়োজনের ত্রুটী নেই। আর ঠিক সেই সময় একদিন দরজার কড়া নড়ে উঠলো, ঘটক মশাই আছেন?

কে? সাতকড়ি বেরিয়ে এসো বললো,—আমিই ঘটক মশাই।

বুঝতে পেরেছি, ভদ্রলোককে বড়ো বেশি ব্যস্ত মনে হ'লো, দেখুন, আমাকে উদ্ধার করুন, বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি—

বসুন, শান্তকণ্ঠে সাতকড়ি বললো, কি বিপদ আপনার?

ভদ্রলোক জানালেন যে মেয়ের বিয়ে দিতে তিনি বিদেশ থেকে এসেছেন। আর কয়েকদিন পরই বিয়ের দিন। সমস্ত আয়োজন সারা হবার সংগে সংঙ্গে পাত্রের মতও ঘুরে গেছে। অনেক চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু এ বিয়ে সে কিছুতেই ক'রবে না।

কি করি মশাই বলুন তো? আমি বোধ হয় পাগল হ'য়ে যাবো, ভদ্রলোক কথা শেষ করলেন।

তাইতো—সাতকড়ি ভাবতে আরম্ভ করলো।

আপনার অনেক নাম শুনে ছুটে আসছি ঘটক মশাই, আমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করতেই হবে।

কিন্তু কি করি আমি?

আপনি এত বড়ো ঘটক, দয়া ক'রে আমায় নিরাশ করবেন না—

মানে, আমিও বড়ো ব্যস্ত কি-না।

সব বুঝি ঘটক মশাই কিন্তু আমার সম্ভ্রম যে আর থাকে না, যেমন ক'রে হোক আমায় অন্য পাত্র দেখে দিন, আপনি সব পারেন!

মাথায় হাত দিয়ে কি যেন ভেবে সাতকড়ি বললো, বড় অল্প সময়—

তবে কি আমাকে আত্মহত্যা ক'রে মরতে হবে?

আহা, কী যে বলেন!

তা'ছাড়া তো আর উপায় দেখছি না।

ভদ্রলোকের নাম গোত্র ইত্যাদি কথায় কথায় সাতকড়ি জেনে নিলো।

আপনার মেয়ে দেখতে কেমন?

বাপ হ'য়ে আর কি বলবো, দয়া ক'রে যদি একবার যান—

বুঝতে পারছি মেয়ে আপনার ভালোই।

আমাকে আশা দিন ঘটক মশাই, অধৈর্য হ'য়ে ভদ্রলোক ব'লে চললেন, আমার সম্ভ্রম রক্ষা করুন, যে হোক, যেমন হোক—একটি পাত্র আমায় এনে দিন!

কয়েক মিনিট ধ'রে সাতকড়ি আবার কী ভাবতে লাগলো। অকস্মাৎ ওর ঘটক—রক্ত চঞ্চল হ'লো। ও-ঘরের ভেতর গিয়ে চাদর জড়িয়ে নিলো গায়ে, ছাতা হাতে নিয়ে, চটিটা পায়ে গলিয়ে ভদ্রলোককে এসে বললো, আসুন আমার সংগে!

সাতকড়ির ফিরতে বেশ একটু বেলা হ'লো। কাজের ভিড়ে বাড়িতে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেছে। কিন্তু সাতকড়ি এখন একেবারে মুক্ত—মস্ত বড়ো দায় তার যেন মিটে গেছে। লক্ষীর বিয়ে এতো তাড়াতাড়ি না-হয় নাই বা হ'লো! কি-ই বা এসে যায় তাতে! সাতকড়ি এতদিন পর সত্যিকার ঘটকের কাজ করেছে—একজন ভদ্রলোকের সম্ভ্রম বাঁচিয়ে দিয়েছে সে। কিন্তু ও কিছুতেই ভেবে পেলো না কথাটা কেমন ক'রে প্রকাশ করবে!

ওগো শুনছো? খুব আস্তে সাতকড়ি সৌদামিনীকে ডাকলো।

কি বলছো ?

বলছিলাম, মানে ইয়ে—

অতো কথা শোনবার আমার এখন সময় নেই, ভয়ানক ব্যস্ত হ'য়ে সৌদামিনী ফর্দ মেলাতে চলে গেলো ।

সাতকড়ি কিছুই বলতে পারলো না। তার মুখে শুধু ফুটে উঠলো প্রচ্ছন্ন গর্বের নির্বিকার হাসি !

আত্মীয়ের আনন্দ-কোলাহলে চারপাশ তখন মুখর হ'য়ে উঠেছে !

বৃহস্পতিবার দুপুর ঃ ২৪শে চৈত্র, ১৩৫০ ঃ কলিকাতা

যান্ত্রিক

ওর শরীর বড়ো বেশি শুষ্ক মনে হয়। লোকটার চোখে-মুখে নৈরাশ্যের জ্বালা ফুটে উঠেছে।

শ্মশানের নীরস সীমানা বিভূতির কর্মস্থল। রাত্রে ওর কর্তব্য আরম্ভ। শবের নাম, বয়স, মৃত্যুর—সময় এই সমস্ত তালিকা প্রস্তত করা ওর কাজ।

চিতায় অগ্নিসংযোগ হ'য়েছে—একটি নয়, দু'টি নয়, বহুচিতায়। বিকট শব্দে মুখরিত চারধার—ফাটলো স্কাল্, চূর্ণ হ'ল অস্থির পর অস্থি—ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চারপাশ। রাত্রির গভীর গাম্ভীর্যে পৃথিবী ভয়ংকর। তবু বিভূতির তন্দ্রা আসে। শবের গন্ধ নাকে নিয়ে রজনীগন্ধার কল্পনা! টেবিলের ওপর মাথা রেখে বিভূতি চোখ বোজে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। অকস্মাৎ একেবারে কানের কাছে ধ্বংসের গান, বলহরি—হরিবোল্!

বিভূতি মাথা তোলে, বিরক্তি মুখে ওর। তারপর যন্ত্রচালিতের মতো প্রশ্ন করে, নাম?...খাতায় লিখতে লিখতে মাথা না তুলে, ক'টার সময় মারা গেল?

তারপর কতো বয়স?

হাত বাড়িয়ে, সার্টিফিকেট?

অবশেষে, নিয়ে যান, বিভূতি কলম নামায়—ক্লান্ত কলম।

বলহরি—হরিবোল্, ভেসে আসে বিষণ্ন শ্মশানযাত্রীর গান।

কোন কোনদিন বিশ্রাম দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে বিভূতির। শবের পর শব—যেন শেষ নেই। বিরক্তিতে বিভূতির সমস্ত শরীর রী রী করে।

গম্ভীর নৈশ অন্ধকার বিদীর্ণ ক'রে কখনও ধ্বনিত হয় তীব্র তীক্ষ্ণ ক্রন্দন—দরিদ্রের একমাত্র সন্তান গেছে। কখনও কখনও বা সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী—এমনি লাখো অভিজ্ঞতায় বিভূতির নীরস জীবন সমৃদ্ধ।

গণ্ডারের লৌহ-কঠিন চামড়া দুর্ভেদ্য আজ। অর্থাৎ বিভূতি গ্রাহ্য করে না আর শোকের এই প্রকাশ। এ ওর অতি পরিচিত আজ, অতি স্বাভাবিক—প্রতি মানুষের শেষ পরিণতি।

কোনদিন বিভূতির অন্তরে করুণার সুর বাজতো। সেকথা আজ স্মরণের সীমানা পেরিয়েছে। প্রথমে এই চাকরি নিয়ে অনুতাপের আগুনে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিলো সে। যেন নরকের দ্বাররক্ষী! কখনও কখনও জীবনের এই করুণ পরিণতি দেখে বিভূতির চোখ ঠেলে কান্না আসতো। সমবেদনায় মুহ্যমান হ'য়ে যেতো ও। সে অনেক কালের কথা।

অনেক—অনেক আগে, আজ সেকথা ভাবতে গিয়ে বিভূতির হাসি পায়। চাকরি পাওয়ার একেবারে অনতিবিলম্বেই ওর অফিস ঘরে আছড়ে পড়লো ক্রন্দনের প্রবল তরঙ্গ—বাবা গেছে, পথে দাঁড়ালো ছেলে। তারই কান্নায় চমকে উঠলো বিভূতি।

তবু প্রশ্ন করলো, নাম—

আর নাম! কে উত্তর দেবে। ছেলের নিদারুন ক্রন্দন চূর্ণ করলো কণ্ঠস্বর। সেদিন বিভূতির বুকে আঘাত বেজেছিলো। ছেলের করুণ মুখ বহুদিন সে বিস্মৃত হ'তে পারে নি।

বাড়ি ফিরে স্ত্রীকেও বলেছিল এ কাহিনী। বলেছিলো, এ কাজ বেশিদিন আমি করতে পারবো না উমা।

স্বামীর মুখ থেকে সহায়হীন ছেলের করুণ কাহিনী শুনে উমার চোখ দিয়েও সেদিন জল ঝরেছিলো।

বিভূতির গৃহ একেবারে শ্মশানসংলগ্ন। কান্নার আওয়াজে উমাও অনেকবার চমকে চমকে উঠতো। কিন্তু আজ আর কারুর কিছুই গায়ে লাগে না। অভ্যাস হ'য়ে গেছে দু'জনের।

উমাও অনেকদিন অনুযোগ করেছে আগে, ওগো একাজ তুমি ছেড়ে দাও, এর চেয়ে না খেয়ে মরা ভালো, দিনরাত চিতা দেখতে আমি পারবো না।

শিগগিরই ছেড়ে দেবো উমা, আমিও একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছি, আর একটা চাকরি পেলেই এখান থেকে পালাবো।

বিগত বহু ঘটনা বিভূতির অন্তরে রেখাপাত করেছিলো। হাজার হলেও রক্ত মাংসে গড়া মানুষ।

এসব অতি পুরাতন কাহিনী। সে-বিভূতি আর নেই। ধ্বংসের হিসেব লিখতে লিখতে সে-পুরাণো বিভূতি আজ ছাই হ'য়ে গেছে। কান্না শুনলে

আজ আর ওর অন্তরে করুণা জাগে না বরং বিরক্তি আসে—কান্নার শব্দে ওর তন্দ্রা টুটে যায় ব'লে।

আজ ওর স্বর কাঁপে না, সমবেদনাও মনে উঁকি মারে না। যন্ত্রচালিতের মতো শুধু শ্মশান যাত্রীর সামনে খাতা খুলে বিভূতি বলে, নাম ?…কটার সময় ?…বয়স ?…সার্টিফিকেট ?…যান……

তবু বিভূতির নিজের সংসার আছে। রাত জেগে ধ্বংসের হিসেব লিখলেও দিনের বেলায় ওকে সংসার খরচের হিসেব রাখতে হয়।

বড়ো বড়ো তিন ছেলে বিভূতির…আর একটি খুব ছোট মেয়ে আর স্ত্রী উমা…এই নিয়েই সংসার।

ছেলেমেয়েরা অভ্যস্ত। জন্ম থেকে শব দেখে আর কান্না শুনে ওরা বেড়ে উঠেছে। সুতরাং জীবনের এই শেষ দৃশ্য দেখে ওরা প্রভাবিত হয় না। কী আছে এতে আশ্চর্যের ? কী আছে ক্রন্দনের ?…ওরা ভেবে পায় না। শ্মশানের হাওয়ায় ওরা নিঃশ্বাস গ্রহণ করে।

মা, আমি চিতায় উঠবো, মেয়ে আব্দার ধরলো।

বালাই ষাট, ওকথা ব'লনা মণি, উমা শঙ্কিত হ'লো।

না মা, আমি চিতায় চড়বো—চারপাশে আগুন—কী মজা !

দূর পাগলী, উমা দেবতার নাম করলো হয়তো।

মাঝে মাঝে মণি মড়া গোণে। একসংগে যেদিন অনেক চিতা জ্বলে সেদিন ওর ভারী ফুর্তি। কী অভাবনীয় অভিনব দৃশ্য। মণি হাত তালি দেয়।

মণিই বিভূতির সব। মেয়েটাকে ও বড়ো ভালোবাসে। সাত বছরের ছোট্ট মণি। বলে আমার নাম মণি দাস।

বাবা বাবা বলতো আজ ক'টা মড়া পুড়েছে ?

একটা, বিভূতি হাসে।

তুমি কিছু জান না, আমি বলি ?

বলো তো ?

একশোটা না বাবা ?

বিভূতি অবাক হ'য়ে মণিকে কোলে তুলে নেয়। ও বাজে বকে। তবু বাবার মতো মণি আবোল তাবোল হিসেব রাখে। বাপেরই মেয়ে তো ! বাপেরই রক্তে শ্মশানে ওর জন্ম। যেদিন খুব কম শব আসে সারাদিন মণি সেদিন বিষণ্ণ।

দিন কয়েক অবসানের পর। দুরারোগ্য রোগের আকস্মিক আক্রমনে মণি শয্যাশায়ী। উপশমের আশা নেই। আত্মীয়ের আবির্ভাবে গৃহ ভ'রে গেছে। প্রচুর পরিচর্যার প্রভাব মণির ওপর। তবু আশা যৎসামান্য। ডাক্তারের মুখ গম্ভীর।

এক দুই তিন চার···মণির প্রলাপ, আরও আসছে, বলহরি—হরিবোল···

মণি মণি, উমার চোখে জল।

ব্যস্ত হয়োনা, আত্মীয়দের সান্ত্বনা, তুমি ঘাবড়ালে চলে কখনো ?

বিভূতির ছেলেদের দৃষ্টি গম্ভীর। সময় আর নেই। মণির দিন শেষ হ'য়ে এলো। সবাই বুঝতে পেরেছে একথা। তবু বিভূতিকে কাজে যেতে হয়েছে। শবের কামাই নেই।

বিভূতির ঘর। সামনে ওর খাতা কলম। নিদ্রার প্রভাব মুখে। চোখ বন্ধ ওর। নৈশ নিস্তব্ধতায় নিঝুম চারপাশ। মাঝে মাঝে কুকুরের ক্ষুধার্ত চিৎকার। রাত অনেক—গম্ভীর অন্ধকার দেখে সেকথা মনে হয়। তন্দ্রাকাতর বিভূতি।

বাবু ?

য়্যাঁ ? বিভূতি চমকে ওঠে, ও কলম নিয়ে খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে, ক'টার সময় ?

বাবু আমি নিশাকান্ত।

ও, বিভূতি হাই তোলে, কী ব্যাপার ?

শিগগির বাড়ি আসুন, মা পাঠিয়ে দিলেন, মণিকে আর বাঁচানো যাবে না বাবু।

বিভূতির তন্দ্রা মুহূর্তে ছুটলো। ও উঠে দাঁড়ালো। তারপর নিজের ঘরের কোণে চাকরকে বসিয়ে সটান ছুটে এলো বাড়িতে।

ক্রন্দন মুখর গৃহ। তীক্ষ্ণ আর্তনাদ ভেসে আসে। ব্যাপারটা বিভূতি বুঝে নিলো। বিষণ্ণ পদক্ষেপে এসে উপস্থিত হলো ঘরের মাঝখানে।

যা' ভেবেছিল তাই। মণির মৃত্যু হ'য়েছে।

বিভূতির মুখে যেন লোহার থাবা পড়লো। মেয়েটাকে ও বড়ো ভালোবাসতো। কান্নার নিদারুণ ধাক্কায় বিভূতির অন্তর ফুলে উঠলো। বিভূতি আছড়ে পড়লো ঘরের মাঝখানে।

আত্মীয়রা সান্ত্বনা দিতে লাগলো। তারপর ওরা প্রস্তুত হলো। মণিকে নিয়ে যেতে হবে। কয়েকটি করুণ মুহূর্ত! অতিবাহিত হলো অনেকক্ষণ।

বাবু? বাবু? শ্মশানের চাকর বিভূতিকে ডাকতে এসেছে।

কী? বিভূতি মাথা তোলে।

বাবু, আসুন শিগগির, অনেক শব জমেছে, আপনাকে না পেয়ে ওরা রাগারাগি করছে।

চল, আস্তে আস্তে বিভূতি উঠে দাঁড়ালো। কর্তব্যের আহ্বান। সাড়া না দিয়ে উপায় নেই। বিভূতি প্রস্থান করলো।

আত্মীয়েরা মণির কানে 'হরিবোল' দিলো। এবার নিয়ে যেতে হবে।

তবু বিভূতিকে ধ্বংসের হিসেব রাখতে হবে। সুতরাং ও উপস্থিত হলো শ্মশানে। অনেক অপেক্ষা করছে বটে।

কোথায় ছিলেন মশাই এতোক্ষণ? আমরা কখন থেকে দাঁড়িয়ে—

শুকনো দৃষ্টিতে লোকটার দিকে চেয়ে বিভূতি চেয়ারে ব'সে পড়ে প্রশ্ন করলো, নাম ?···

জগন্নাথ পাল।

ক'টার সময় ?

রাত দশ্‌টা।

সার্টিফিকেট ? বিভূতি হাত বাড়ায়, নিয়ে যান। তারপর অন্য আর একজনকে, নাম ?

কালিদাস ঘোষ।

ক'টার সময় ?

রাত এগারোটা।···যন্ত্রের মত অতিদ্রুত বিভূতি কলম চালিয়ে যায়। ওর যেন প্রাণ নেই। একের পর এক ও হিসেব লিখে যাচ্ছে মাথা নিচু ক'রে। এমনি ক'রে আরও কয়েকজনের কথা লেখা হলো। তারপর আবার, বলহরি—হরিবোল্‌······

মাথা না তুলে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বিভূতি প্রশ্ন করলো, নাম ?

মণিদাস, উত্তর এলো।

ক'টার সময় ?

রাত বারোটা।

বয়স ?

সাত বছর।

সার্টিফিকেট ?···সেটি হাতে নিয়ে, নিয়ে যান।

বিভূতির মুহূর্তের অবসর নেই। আরও অনেক দাঁড়িয়ে।

চিতার আগুনে বীভৎস হ'য়ে উঠেছে শ্মশানের চারধার। রাত্রির শেষের দিক। শোনা যায়, বলহরি—হরিবোল্‌। অদ্ভুত ভয়াবহ আবহাওয়ায় শ্মশান কণ্টকিত। সমস্ত পৃথিবী যেন আজ শুকিয়ে গেছে। বিভূতি লিখে চলেছে ধ্বংসের হিসেব······নাম ?······ক'টার সময় ······বয়স······ সার্টিফিকেট······

সোমবার সকাল : ১৮ই কার্তিক, ১৩৪১ : কলিকাতা

থাবা

কতো লোক আসে, কতো লোক যায়—কতো রকমের, কতো বয়সের লোক। বংকু তাদের চেহারা ফিরিয়ে দেয়—কারুর দাড়ি ছাঁটে, কারুর করে কেশ-প্রসাধন।

'প্রসাধন' নামটিও বেশ। নামের নতুনত্ব দেখেই হয়তো এখানে লোক আসে বেশি। কর্তা গোবিন্দর মাথা আছে বলতে হবে। ব্যবসা চালাতে জানে সে।

সব দিক দিয়েই গোবিন্দ কর্তব্যপরায়ণ—একটু বেশি মাত্রায় বোধ হয়। সকাল ছ'টায় প্রত্যেককে উপস্থিত হতে হয়। কোন কর্মচারীর আসতে এক মিনিট দেরি হলে আর রক্ষে নেই, বিশ্রী ব্যবহার আর গালাগাল আরম্ভ করে সে। প্রত্যেকে তাকে বাঘের মতো ভয় করে। না করে উপায় কি!

বংকুর সংগে গোবিন্দর বাধে মাঝে মাঝে। অতো কর্কশ কথা ভালো লাগে না বংকুর। সে ভদ্রলোকের ছেলে। আজ দৈবদুর্বিপাকে সেলুনের নাপিত। এ কাজ তার শোভা পায় না। কিন্তু বাঁচতে হবে। সুতরাং বংকুর কাঁচি চলে, কখনও ক্ষুর।

আসতে বোধ হয় মিনিট কয়েক মাত্র দেরি হয়েছিল বংকুর। ইচ্ছে করে দেরি সে করেনি, কোনদিন করেও না। স্ত্রীর অসুখ হঠাৎ বেড়ে যায় কাল রাত্রে। যক্ষ্মা রোগী, কখন কেমন থাকে বলা কঠিন। কাল অনেকবার রক্ত বমি করে অন্নদা। ফলে সারারাত বংকুকে জেগে কাটাতে হয়। তাই আজ দেরি হয়েছে তার কাজে আসতে। আসবার আগেই বংকু জানতো গোবিন্দ তাকে আজও ছেড়ে কথা বলবে না। আর একদিনকার কথা মনে পড়লো বংকুর।

দেখুন গোবিন্দদা, বংকু বলেছিল।

কী বল্ না ?

বলছিলাম পরিবারের বড় অসুখ—

আমি তার কী করবো ? ডাক্তারের কাছে যা না—

ডাক্তারের কথা নয়, বলছিলাম অসুখটা আজকাল বেড়েছে—

কী অসুখ ?

বংকু মাথা চুলকিয়ে বললো, অসুখটা খারাপ—

বল্ না। যক্ষ্মা—?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

গম্ভীর হয়ে গোবিন্দ বললো, পরিবার আর রোগ পেলো না—যাক্‌গে ভুলেও বোকার মত কারুর সামনে বলে বসিস না। লোকে শুনলে এখানে আর চুল ছাঁটতে আসবে না, বুঝলি পাঁঠা ?

পরিবারের অসুখ বেড়েছে বলেই আপনার দয়া চাইতে এসেছি—

না না, গোবিন্দ মুখ বেঁকিয়ে বললো, টাকা পয়সা নেই আমার, বড়ো টানাটানি এ মাসে—সেলুনের জন্যে ক্ষুর দশদিন ধরে কিনবো কিনবো ক'রেও কিনতে পারছি না—

টাকা পয়সা নয়, বংকু বাধা দিয়ে বললো।

তবে ?

এক ঘন্টা আগে যদি রোজ দয়া করে ছুটি দেন—

যা যা বেটা নবাব, তোর পরিবার যদি বারোমাস ভোগে, একটু বিরক্ত হয়ে গোবিন্দ বললো, তাহলে এক বছর এক ঘন্টা আগে তোকে ছুটি দিতে হবে, রোজ একঘন্টা হলে বছরে কদিন ছুটি হয় হে চাঁদ ?

বাড়িতে আমার কেউ নেই গোবিন্দদা—

আমি তার কি করবো ?

দয়া করেন যদি—

থাম থাম, রংগ করার আর জায়গা পাসনি ? অতো পীরিত থাকলে কাজ ছেড়ে দিয়ে পরিবারের মুখের দিকে চেয়ে বসে থাকগে যা না—

এর উত্তরে বংকু একটি কথাও বলতে পারেনি। একটা চাপা নিদারুণ আক্রোশে তার সমস্ত শরীর রী রী করেছিল শুধু। তারপর আবার আজ।

কি হে নবাব ? কর্কশ স্বরে গোবিন্দ প্রশ্ন করলো।

একটু দেরি হয়ে গেলো—

জুতো মেরে দূর করে দেবো উল্লুক—

দেখুন ইচ্ছে করে নয়, বাধা দিয়ে বংকু বললো।

...কৈফিয়ৎ রাখ্, খদ্দের এসে ফিরে যায়, না পারিস বলে দে না, নবাবী এখানে চলবে না।

নবাবী করলাম কখন ?

মুখের ওপর কথা বললে লাথি মেরে মুখ ভেঙে দোবো শুয়ার !

গোবিন্দদা আমি ভদ্রলোকের ছেলে মনে রাখবেন।

মুখে বড়ো বড়ো কথা যে! বলি সেদিনের কথা মনে নেই ? কোথায় ছিল তোর ভদ্রলোকের গরব রে ?

বংকু আর কিছু না বলে পুরানো ক্ষুর টেনে নিয়ে ধার দেয়। এ লোকের কাছেই যখন কাজ করতে হবে তখন তাকে চটানো বৃথা। জলে বাস করে কুমিরের সংগে কলহ করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

অবশ্য গোবিন্দর কাছে বংকুর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। সেদিনের দুর্দশার কথা ভাবলে আজও তার গায়ে জর আসে। বিশাল নগরীতে সে একা। জাত-বসন্তে মা বাপ ভাই বোন সব গেছে—বংশের ম্লান স্তিমিত প্রদীপ হয়ে রইলো সে শুধু।

অনাহারে কাটলো কয়েকদিন। কাজের চেষ্টায় ঘুরে ঘুরে তার শরীর খারাপ হলো শুধু। অনেকবার আত্মহত্যার চেষ্টা করলো বংকু। মরতেও পারলো না। নিদারুণ জ্বালায় কোন রকমে সে বেঁচে রইলো।

এমনি দুর্দিনে তার সংগে গোবিন্দের আলাপ। সে যেন পথ থেকে বংকুকে কুড়িয়ে পেলো। হাতে স্বর্গ পেল বংকু।

শোন্, তোকে আমি কাজ শেখাবো—

কী কাজ ?

আমার মস্ত বড়ো সেলুন আছে, নাম প্রসাধন, সেখানে চুল ছাঁটতে হবে তোকে।

নাপিতের কাজ ? বংকু একটু কুঁকড়ে গেলো যেন, আমি যে ভদ্রলোকের ছেলে—

রাখ তোর ভদ্রলোক, খেতে না পেয়ে মরে যাবি যে আমার ভদ্রলোকের সোনার চাঁদ।

আচ্ছা, আমায় কাজই শেখান বাবু, ক্ষিদের জ্বালায় বংকু উত্তর দিলো।

সেই থেকে সযত্নে গোবিন্দ নিজের হাতে বংকুকে চুল ছাঁটাতে শেখায়।

নিজের বাড়িতে তাকে অনেক দিন খাওয়ায়। গোবিন্দর কাছে বংকুর কৃতজ্ঞ থাকা উচিত বৈকি!

ভদ্রলোকের সন্তান—একথা বংকু আজকাল ভুলেই গেছে প্রায়। 'প্রসাধন'কে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। আর একথা মিথ্যে নয় যে শুধু তার জন্যেই এখানে অনেকে চুল ছাঁটতে আসে। তাই মনে মনে একটু গর্বও ছিল বংকুর। এটা তো কম কথা নয়—অনেক দূর থেকে এখানে লোক আসে শুধু তার জন্যে। 'প্রসাধনে'র সবাই একথা জানে। অন্যান্য বহু কর্মচারীর এই জন্যে বংকুর ওপর একটু হিংসেও ছিল। তা থাক। বংকু গ্রাহ্য করে না ওসব। সামনে কেউ কিছু বললে দুকথা শুনিয়ে দেয়।

আরও অনেকে করে 'প্রসাধনে'। কানাই, হীরু, গদা আর কয়েকজন। ওরা প্রত্যেকেই মাতাল, দুশ্চরিত্র। ওদের কথাবার্তা বংকুর কেমন যেন লাগে।

কি রে বংকা, কেমন?

কী বলছো?

ফুর্তিতে আছিস বল্?

কী ফুর্তি?

কাজে আসো দেরি ক'রে, রাত কাটাও কোথায় চাঁদ?

কোথায় আবার বাড়িতে।

মা-ই-রি? দাঁত বের করে এক গাল হেসে কানাই বললো, বাড়িতেই আনাও, পয়সা আছে তোমার তাহলে?

কী, বলছো কী? তোমার কথা বুঝতে পারছি না।

তা পারবে কেন? হীরু বললো, বাড়িতে রুগী পরিবার—তার মুখের দিকে চেয়ে সারারাত বসে থাক বললে, কেন বিশ্বাস করবো যাদু?

পরিবারের নাম নিয়ে ইয়ার্কি করো না, বংকুর মুখে বিরক্তি প্রকাশ পেলো।

ফোস্কা পড়লো যে, হেসে গদা বললো, বড়ো পীরিত যে, ভয় নেই—তোমার রুগী পরিবারের দিকে আমরা চোখ দেবো না—

রোগের ভয় আছে আমাদের, কানাই কথাটা শেষ করে দিলো।

বংকুর ইচ্ছে করলো ঘুষি মেরে বর্বরগুলোর মুখ বন্ধ করে দিতে। কিন্তু কিছু বলতে পারলো না সে। অতোগুলো লোককে ঘাঁটাতে সাহস হ'লো না তার। মাতাল, দুশ্চরিত্রদের সে সব সময় এড়িয়ে চলতে চায়।

যাবি নাকি বংকু? হীরু প্রস্তাব করলো।

কোথায়?

আজ রাতে আমাদের সংগে। খুব ভাল জায়গা মা-ই-রি, একবার ঢুকলে আর বেরুতে চাইবি না। আর গান যা গায়—

যেন পোষা বুলবুলটি, কানাই বাকিটা বলে দিলো, খরচ কিন্তু বেশি নয়। এতোদিন এক সংগে কাজ করলি, একবারও তো নিয়ে গেলি না?

চল্ না মাইরি আজ, হীরু মিনতি ক'রে বললো।

আমি ওসব ভালোবাসিনা, ফের আমার সামনে ওসব কথা বললে গোবিন্দদাকে বলে দেবো বলছি।

দূর বেইমান!

গোবিন্দ যে এদের কথা জানে না তা নয়। কিন্তু কিছু বলে না। ঠিক মতো কর্মচারীরা কাজ করলে মাটির মানুষ গোবিন্দ। কিন্তু কাজে অবহেলা করলেই চামারের চেয়েও অধম।

রবিবার।

খুব সকালে দেখা গেলো 'প্রসাধনে' শুধু দুজন এসেছে। বংকু আর গোবিন্দ। আজকের দিনে সব চেয়ে বেশি খদ্দের আসে। তাই বংকুকে আসতে হয় অন্যান্য দিনের চেয়ে অনেক আগে। এখনো কেউ আসেনি। গোবিন্দ হিসেব মেলাচ্ছে বোধ হয়। আর খদ্দেরের প্রতীক্ষায় বংকু দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।

কিছুক্ষণ পর একজনকে প্রবেশ করতে দেখে বংকুর সারা অংগ ঘিন্‌ঘিন্ করে উঠলো। কী কুৎসিত আর বীভৎস লোকটার চেহারা! মুখে চাকা

চাকা দাগ, চুল উস্কোখুস্কো, মুখ থেকে বেরুচ্ছে সস্তা মদের গন্ধ। চেহারা দেখলেই বোঝা যায় কোনো জঘন্য পল্লী থেকে এই মাত্র সে উঠে আসছে। লোকটাকে স্পর্শ করতে হবে ভেবে বংকুর সর্বাংগ কুঁকড়ে গেলো। চুপ করে একদিকে দাঁড়িয়ে রইলো সে।

চেয়ার টেনে নিয়ে লোকটা গোবিন্দকে প্রশ্ন করলো, কই, আপনাদের লোক কই ?

বংকু, গোবিন্দ বংকুর দিকে চেয়ে বললো।

মাপ করবেন, গোবিন্দর মুখের ওপর সে সটান ব'লে বসলো।

নাও, দাড়িটা বেশ ভালো ক'রে কামিয়ে দাও বাপু—

আমি পারবো না।

কী! গর্জে উঠলো গোবিন্দ, কাকে কী বলছিস ?

দৃঢ় স্বরে বংকু বললো, একে ছুঁতে আমি পারবো না।

কেন বাপু? লোকটার চোখমুখ লাল হয়ে গেল, মুখের দাগগুলো দেখে ভড়কে গেলে বুঝি? মাইরি বলছি, ও খারাপ রোগের দাগ নয়। নাও, গোপাল আমার, কামিয়ে দাও চট করে, সারারাত ঘুম হয়নি। দেখছো না, চোখ দুটো ঢুলুঢুলু? বাড়ি গিয়ে লম্বা ঘুম দিতে হবে। নাও—

না, আমি পারবো না, বংকুর মুখে সেই এক কথা।

ভালো বাদশা পুষেছেন মশাই, লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বললো, নাপতের আবার আমীরি, যত্ত সব—বেরিয়ে চলে গেলো রবিবারের প্রথম খদ্দের।

বেরিয়ে যা, দূর হয়ে যা, নয়তো খুন করবো তোকে, গোবিন্দ সত্যি ক্ষুর তুলে নিলো, খদ্দেরকে অপমান! হারামজাদা! রবিবারের প্রথম খদ্দের ফিরে গেলো—আমার সেলুনের বদনাম! তোর মুখ দেখতে চাই না, শুকিয়ে মর্ শুয়োরের বাচ্চা। আমার সুমুখ থেকে এখুনি চলে যা, ক্ষুর খুলে গোবিন্দ বংকুর দিকে এগিয়ে এলো।

বংকু বেরিয়ে গেলো।

কাজে—বারকয়েক কেশে সকরুণ মুখে স্বামীকে প্রশ্ন করলো অন্নদা, কাজে যাবে না ?

ছুটি নিয়েছি, মিথ্যা কথা বলতে বংকুর মুখে বাধলো না। রুগ্ন স্ত্রীর দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে কী লাভ ?

কর্তা ছুটি দিলো ? অন্নদা হাসলো। ম্লান সে হাসি।

হ্যাঁ, পাছে সব কথা বেরিয়ে পড়ে তাই সে-ঘর ছেড়ে বংকু এলো রান্নার যোগাড় করতে। অন্নদা আজ বিশ্রাম করুক। এই রোগ নিয়ে বেশি পরিশ্রম করা উচিত নয় তার। আর আজ তার অবস্থা বিশেষ ভালো নয়।

বংকুর ভারী মায়া হয় স্ত্রীর জন্যে। বিনা চিকিৎসায় দিনে দিনে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে অন্নদা। উপায় নেই। ওরা দরিদ্র। ডাক্তার আনার সামর্থ্য নেই। মুখ বুজে মরণ বরণ করা ছাড়া কিই বা করবার আছে ওদের ?

কিন্তু রান্না ঘরে এসে বংকু অবাক হলো। ভাণ্ডার শূন্যপ্রায়! আজ চললেও দিন কয়েক পর অচল হবে সংসার। পৃথিবী যেন দুলে উঠলো। যক্ষ্মা রোগীকে যদি দিন কাটাতে হয় উপবাসে—বংকু আর ভাবতে পারে না। আর একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করলে কেমন হয় ?

তবু ও রান্নার যোগাড় ক'রতে লাগলো।

ও কী ? বিস্মিত হ'য়ে অন্নদা স্বামীর পেছনে এসে দাঁড়িয়ে বললো।

কেন ? মাথা তুলে বংকু বললো, তুমি আবার উঠলে কেন—

থাক্ থাক্, অন্নদা মুচকি হেসে স্বামীর হাত থেকে মশলার সরঞ্জাম টেনে নিলো, যাও তুমি—

আঃ—

যাও।

অগত্যা বাধ্য হয়ে বংকুকে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হ'লো। তারপর দুপুর। বংকু শুয়েছিল। ওর বড়ো খারাপ লাগছে আজ। খুঁত খুঁত করছে মন। আঙুলগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে বারবার—ও যেন কাঁচি চালাচ্ছে। কতোদিন—কতোদিনের অভ্যাস! কাঁচি ছেড়ে ও বাঁচবে কেমন করে ?

রবিবারের দুপুর। বংকু কল্পনা করতে লাগলো 'প্রসাধনে'র কথা। লোকে-লোকে ভরে গেছে সেলুন। গল্পে, হাসিতে, কতো রকম আলোচনায় মাতাল সে-সুন্দর ঘর, আর চলছে তার কাঁচি অবিশ্রাম। আনন্দে বংকুর মন ভরে গেলো।

সুন্দরভাবে সাজানো ‘প্রসাধন’। বড়ো বড়ো আয়না চারপাশে, অসংখ্য উজ্জ্বল দীপ, মূল্যবান চেয়ার আর মাথার ওপরে পাখা। এসব দেখে শুনে ঘরে ফিরে আসতে ইচ্ছেও করে না. বংকুর। এসব ছেড়ে কে দেখতে চায় স্ত্রীর শীর্ণ রুগ্ন শরীর আর দারিদ্রের দারুণ মূর্তি—কে দেখতে চায়! সে চেয়ে দেখলো নিজের ঘরের দিকে আর সংগে সংগে তার মন গেলো বিষিয়ে। কী সংকীর্ণ সে-ঘর—কী কুৎসিত! দারিদ্র্যের বিকট রূপ চারপাশে। সে ছুটে যেতে চাইলো ‘প্রসাধনে’র উদ্দেশে। তার রক্তের সংগে মিশে আছে কাঁচি আর ক্ষুর। এ বন্দীশালায় হাঁপিয়ে উঠলো সে। অসহ্য! বংকুর নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে গেল। একটা চাপা অব্যক্ত যন্ত্রণায় তার সমস্ত শরীর জ্বলে যাচ্ছে যেন। না, কোন মতেই কাজ ছেড়ে সে বাঁচতে পারবে না। রক্ত জ্বলছে তার কাঁচি আর ক্ষুরের অভাব।

* * * *

পরদিন সকালে বংকুর রক্তে বাজলো কার আকুল আহ্বান! আজ ‘প্রসাধনে’ গিয়ে কাঁচি না ধরলে ও মরে যাবে। ধীর পদক্ষেপে সে বেরোলো ‘প্রসাধনে’র উদ্দেশে।

মাঝে মাঝে গোবিন্দর সংগে বেধে গেলেও বংকু ভালোবেসেছে এই ‘প্রসাধন’কে। তাই কলহ করতে করতে জ্বলে উঠলেও মুহূর্তে সে নিবে যায়। কেমন সুন্দর সাজানো ঘর! এ ছেড়ে কেমন করে যাবে বংকু? তার চেয়ে গোবিন্দর গালাগাল সহ্য করা ভালো। গোবিন্দদা তাকে পথ থেকে তুলে এনে কাজ শিখিয়েছে। আজ তার কাছে অনেক দূর থেকে লোক আসে কার জন্যে? এবার থেকে গোবিন্দর মুখের ওপর কোন কথা আর বলবে না ঠিক করলো সে। কৃতজ্ঞতা ব'লে একটা কথা আছে তো—হাজার হলেও বংকু ভদ্রলোকের ছেলে। দেখা যাক গোবিন্দদা কী বলে! তার পা জড়িয়ে ধরতেও আজ আর বংকুর আপত্তি নেই।

ওই তো ‘প্রসাধন’। বোঝা যাচ্ছে খদ্দের এসেছে এর মধ্যে। অসহ আবেশে অবশ হলো বংকুর কৃশ শরীর।

গোবিন্দদা !

কে ?

আমি বংকু ।

কেন এসেছিস ভেতরে ?

আমি এসেছি, গোবিন্দদা—

বেরিয়ে যা শুয়ার, গোবিন্দ যেন ফেটে পড়বে এখুনি ।

দয়া করুন গোবিন্দদা—বংকু তার পায়ের ওপর পড়তে গেল ।

দূর হয়ে যা, ঠাস্ করে এক চড় গোবিন্দ মারলো তাকে ।

উঃ ! মাথাটা যেন ঘুরে গেলো বংকুর ।

গো—গোবিন্দদা—

আবার আর এক চড় ! বংকু ঘুরে পড়লো গোবিন্দর পায়ের ওপর !

দুপুর ঃ ১৮ই ফাল্গুন ১৩৪৮ ঃ কলিকাতা

ছানি

জীর্ণ কোট, নোংরা প্যান্ট্ আর তালি দেয়া জুতো—দূর থেকে দেখলেই সত্যেনকে চিনতে কারুর দেরি হয় না। খুব সকালে যখন চায়ের ধোঁয়া আর যুদ্ধের উত্তেজনাময় খবরে বহু ঘর গরম হয়ে ওঠে তখন সে প্রবেশ করে কাফে—ডি লুক্সে।

নামটি জাঁকালো সন্দেহ নেই। কিন্তু রেস্তোরাঁর ভেতরে গেলেই দম বন্ধ হয়ে আসে। ইঁদুরের বাচ্চাও দেখা যায়। এসবে সত্যেন অভ্যস্ত। ভাঙা কাপে কালো চা খেতে খেতে বাংলা কাগজখানা ও চোখের ওপর মেলে ধরে। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ—কোন ঋতুতেই এর ব্যতিক্রম হয় না। প্রচুর চা না হ'লে ও বাঁচবার কল্পনাই করতে পারে না। আর স্যুটটা গায়ে চড়ালেই ওর মেজাজ বদলে যায়। তাই প্রত্যহই ওকে দেখা যায় এই কাফেতে।

তারপর নোটবুক দেখার পালা। আস্তে আস্তে পকেট থেকে নোটবুক বের করে সত্যেন। অনেক জায়গায় যেতে হবে আজ। এমাসে কয়েকটা পলিসি না করালেই নয়। বড়ো টানাটানি চলেছে ক'দিন থেকে।

মাঝে মাঝে বেয়াড়া লোকগুলোর ওপর সত্যেনের রাগ হয়। এমন মূর্খ ওরা যে নিজেদের মংগলের কথাও কানে তোলে না। সত্যেন তো ওদের কাছে যায় দেবদূতের মতো হয়ে। নয়তো ওর কি:! আজ তুমি মস্ত বড়ো লোক! গাড়ি বাড়ি, ঝি চাকর নিয়ে ঘর করছো কিন্তু কাল হঠাৎ তুমি যখন মারা যাবে—তোমার সংসারের সেই ভয়ংকর দিনগুলির কথা একবার ভেবে দেখেছো?···লোকে ভেবে দেখে না। সত্যেনের হাড়ে অভিজ্ঞতা—বোঝাতে গেলেও লোকগুলো চটে যায়। রাগে দুঃখে মন জ্বলে যায় সত্যেনের। কী মূর্খ লোকগুলো!

কিন্তু তার রাগ ক্ষণিকের! ও রোমকূপ দিয়ে অনুভব করে প্রত্যেক পরিবারের জন্যে। তাদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে সত্যেনের ঘুম হয় না।

অনেক ভালো ভালো কথা ও ভেবে রাখে কেমন ক'রে তাদের বোঝাবে।

পথে শব দেখলেই সত্যেনের সারা শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে। চোখ বুজে ও কল্পনা করে নেয় বহু ক্লান্ত ক্লিষ্ট সন্তানের মুখ! আহা, হয়তো বেচারীদের পথে পথে ঘুরতে হবে—অন্ন জুটবে না একমুঠো!

অথচ এই লোকের কাছ থেকে হয় তো সত্যেন কুকুরের মতো বিতাড়িত হ'য়ে এসেছে একদিন—যেদিন তাকে পলিসির কথা বোঝাতে গিয়েছিল। খুব গম্ভীর মুখে আর পাঁচজনের মতো এই ভদ্রলোকও বোধ হয় বলেছিলেন, আমি ইনসিওর করবো না, সময় নষ্ট করবেন না, যান—

এই সেদিন অবধি একথার পর সত্যেনের মাথা নিচু হ'য়ে যেতো, কপাল ঘেমে উঠতো, ঝাঁ ঝাঁ ক'রে উঠতো কান দু'টো, পালিয়ে বাঁচতো ও।

কিন্তু এখন নিজের বোকামী সত্যেন বুঝতে পেরেছে। এত সহজে হাল ছাড়লে চলে না। মূর্খ সকলে, তাদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দেবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে সে।

যখন কোন ভদ্রলোক বলেন, সময় নষ্ট করবেন না যান—

সেকথা কানে না তুলে চট করে সত্যেন বলে ওঠে, সময় নষ্ট হবে কেন স্যার? যে ভয়ংকর সময় সুদূর ভবিষ্যতে আপনার পরিবারকে বিচলিত করতে পারে, আজ কিছুটা সময় আমাকে দিয়ে সে-সময়টাকে আপনি হত্যা ক'রে দিন।

না না, আপনি যান—

আবার কবে আসবো?

আর আসতে হবে না।

একটু ভেবে দেখবেন স্যার—

ভেবে আমি খুব দেখেছি—

'পলিসি' করিয়েছেন বুঝি?

হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ—

সত্যেন আজকাল আর চটে না। সহানুভূতির মৃদু হাসি হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে। এমন লোকের সংখ্যা কমাতে হবে। কী অবুঝ আর অন্ধ এরা!

কিন্তু কাফেতে বসে আর নয়। কাপে শেষ চুমুক দিয়ে সত্যেন উঠে পড়লো। তারপর আস্তে আস্তে এসে দাঁড়ালো রাস্তায়। শীতের সকালে পথ চলতে মন্দ লাগে না।

প্রথমে যেতে হবে একজন ইস্কুল-মিস্ট্রেসের কাছে। তার একটাও 'পলিসি' নেই সে-খবর পেয়েছে সত্যেন। সেই অদেখা মিস্ট্রেসের কথা ভেবে সে একটু দুঃখ অনুভব করলো মনে মনে।

হয় তো তার উপার্জনেই সংসার চলে! কী পরিশ্রমই করতে হয় ভদ্রমহিলাকে! কাল যদি তিনি অসুস্থ হ'য়ে পড়েন কিংবা এমন একটা কিছু ঘটে যায় যখন আর তিনি উপার্জন করতে পারবেন না—সত্যেন কী যেন ভেবে নিলো চোখ বুজে। হ্যাঁ, তাকে বেশ ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হবে। সত্যেন ভাষা সাজাতে লাগলো। মেয়ে তো—হয় তো কিছুতেই বুঝতে চাইবে না।

কে আপনি? মিস মিত্র বি, এ, বি-টি, জিজ্ঞেস করলেন।

বলছি বলছি, সবিনয়ে হেসে উঠে সত্যেন বললো, বসুন।

আপনিও বসুন; মিস মিত্র বসলেন।

বসছি বসছি, সত্যেন বললো, আমি আসছি আপনার মামাতো ভাই রজতের কাছ থেকে—

ও, সে কী করছে আজকাল? লেখাপড়া তো হলো না কিছুতেই—

তাতে কী দেখুন, সে তো এখনি ভালোই রোজগার করছে—

কি রকম?

দি গ্রেট ইনসিওরেন্সে আছে।

ও তা তো বটেই, লেখাপড়া তো আর হ'লো না, ইনসিওরেন্স কোম্পানী ছাড়া কোথায় যাবে?

আমিও ওই কোম্পানীর লোক, এই ফাঁকে বলে ফেললো সত্যেন, খুব বড়ো কোম্পানী আমাদের—

তাতে আমার কি বলুন? মিস মিত্র একটু অধৈর্য হয়ে উঠলেন যেন।

না না, আপনার কিছু না, দরকারটা আপনার সংগে আমারই, একটু থেমে সত্যেন বললো, দেখুন মিস মিত্র, রজতের কাছ থেকে শুনেছি আপনি শিক্ষিতা, বিদুষী, অনেক স্বার্থ অনেক সুখ শিক্ষার জন্য আপনি ত্যাগ করেছেন, শিক্ষাব্রতের চেয়ে বড়ো আপনার জীবনে আর কিছুই নয়—

মিস মিত্রের মন ভিজলো, তিনি হাসলেন।

সত্যেন বলে চললো, শুনতে পাই সাধারণ আজ আপনার মূল্য বুঝেছে এবং আপনার এই মহাব্রতের পারিশ্রমিকও আপনি পাচ্ছেন।

কই আর ?

সেকথা তো আপনি বলবেনই, আপনার যা মূল্য সে-পারিশ্রমিক দেয়ার সাধ্য কার আছে, তবু লোকে বুঝেছে যে আপনি সত্যিই বিদুষী।

না না, কি যে বলেন, মিস মিত্র বিনয় প্রকাশ করলেন।

বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্, আপনার কথা-বার্তা শুনে আমার এখন সেই কথাটাই মনে পড়ছে মিস মিত্র।

আপনি কী আপনার কারুর জন্যে আমাকে প্রাইভেটে রাখতে চান ?

না না, সত্যেন জিব্ বের ক'রে বললো, সে-সাধ্য কি আমার আছে! রজত আমার বিশেষ বন্ধু, কাজেই আপনিও আমার বোনের মতো, একটু চুপ করে থেকে সত্যেন বললো, রজতের মুখ থেকে শুনেছি, পাঁচজন পুরুষ যা পারে না, আপনি একাই তা উপার্জন করেন এবং অনেকের অসুবিধা দূর হয়েছে আপনারি জন্যে···

কী যে বলেন, মিস মিত্রর মুখে বিনয়ের ছায়া নামলো।

শিক্ষা নিয়ে আপনি এতো সময় ব্যয় করেন যে অন্য কোন দিকে চোখ দেবার সময় আপনার নেই।

হ্যাঁ, সত্যি বড়ো পরিশ্রম করতে হয় আমাকে!

আমি আপনার বড়ো ভাইএর মতো হয়ে এসেছি আপনাকে শুধু একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে।

বলুন!

আরাম প্রত্যেকেই চায় মিস মিত্র, প্রত্যেক মানুষই বিশ্রাম চায়।

সত্যি কথা।

আপনি যে-টাকাটা ব্যাঙ্কে ফেলে রাখেন, আমাদের কোম্পানীতে তার সামান্য অংশও রাখলে আপনি অনেক বেশি লাভবতী হবেন···

কিসের কোম্পানী আপনাদের ?

বললাম যে, দি গ্রেট লাইফ ইনসিওরেন্স্—

ও, মিস মিত্র উঠে দাঁড়ালেন, আপনি আমাকে দিয়ে ইনসিওর করাতে এসেছেন ?

হ্যাঁ, মানে—বসুন।

আমার আগেই বোঝা উচিত ছিল মশাই !

হ্যাঁ হ্যাঁ—

আমি ইনসিওর করাবো না।

আপনার মত বিদুষী মহিলা—

হ্যাঁ, বিদুষী বলেই করবো না, ওসব প্রতিষ্ঠানের ওপর আমার শ্রদ্ধা নেই, বিশ্বাসও নেই।

কী বলছেন মিস মিত্র ? সত্যেনের চোখ বড় হয়ে গেলো।

দেখুন মশাই, হাত নেড়ে মিস মিত্র বলতে লাগলেন, যাদের কিছু হয় না তারা যায় আপনাদের প্রতিষ্ঠানে, মূর্খ আর বখাটেরা যে-প্রতিষ্ঠানের দালাল সে-প্রতিষ্ঠানের ওপর আমার শ্রদ্ধা থাকবে কেমন করে বলুন ? আমার ভাই রজতকেই তো দেখছেন, লেখাপড়া হ'লো না তাই গতি হ'লো ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে। লেখাপড়া হলে কি আর ও ধার মাড়াতো ? আচ্ছা নমস্কার, গট গট করে মিস মিত্র বেরিয়ে গেলেন।

মিনিট কয়েক স্তব্ধ হয়ে সত্যেন দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বেরিয়ে এলো ঘর থেকে আস্তে আস্তে।

মুখে ওর ম্লান হাসি !

চারপাশে মৃত্যুর ছায়া ! সত্যেন ভুলেই গেছে যে সে বেঁচে আছে।

সুখী পরিবার দেখলেই ও শিউরে ওঠে। সব যাবে ! অলক্ষ্যে একদিন হাত বাড়াবে মৃত্যু। ব্যস্, সব শেষ !

কী অদ্ভুত মানুষ ! কী অন্ধ তারা ! সত্যেন প্রাণপণে চায় তাদের চোখ

ফুটিয়ে দিতে। নিদারুণ পরিশ্রম করতে হয় তাকে। অপমান তার গায়ে লাগে না। ক্ষুধার্ত ক্লান্ত সত্যেন দ্বার থেকে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়।

মাঝে মাঝে ওর হাসি পায়। একটি লোকও বুঝতে পারলো না তাকে। বন্ধুরা এড়িয়ে চলে, আত্মীয়রা পর ক'রে দিয়েছে। এমনি হয়, দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো সত্যেন, পরের জন্যে কাঁদলে পর হ'য়ে যেতে হয়।

আর কোনদিকে সুবিধা করতে না পেরে বীমা কোম্পানীতে সত্যেন আশ্রয় পেয়েছিল সেকথা সত্যি। প্রথম প্রথম লজ্জায় তার কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে আসতো, অচেনা লোকের সামনে দাঁড়ালে দম বন্ধ হয়ে যেত প্রায়, পা টলতে সুরু হ'তো—ওর মনে হ'তো ও আর বেঁচে নেই!

এমন অনেকদিন তার গেছে, যেখানে একবার মুখ ফুটে বললেই একটা মোটা রকমের 'পলিসি' হ'য়ে যেত—সেখানে লজ্জায় সে একটি কথাও বলতে পারেনি। অনেক বাড়ি থেকে সে ফিরে এসেছে।

কিন্তু সে অনেকদিনের কথা।

আজকাল যন্ত্রের মতো হ'য়ে গেছে সত্যেন। নতুন ক'রে লোককে সে বোঝাবার চেষ্টা করে, নতুন কথা বলে তাদের মুগ্ধ করতে চায়।

কিন্তু প্রতিপদে সত্যেনকে গোপন করে চলতে হয় যে ও দালাল। তুমি যতো সুন্দর ক'রেই কথা বলনা কেন—প্রথমেই যদি লোকে বুঝতে পারে যে তুমি দালাল—ব্যস্ সব মাটি, বুঝে নিও আর কোন আশা নেই। আগে লোকের মন জয় করে নিতে হবে কথার মালা গেঁথে। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় সত্যেন সে-বিদ্যা ভাল ভাবেই আয়ত্ত করেছে। তবু খুব সাবধানে ওজন করে তাকে কথা বলতে হয়—একটু এদিক—ওদিক হলেই মুশ্‌কিল।

একটা প্রকাণ্ড বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো সত্যেন। এখানেই প্রবেশ করতে হবে তাকে। নিজের দিকে একবার চেয়ে দেখলো ও। কী বিশ্রী পোশাক তার! বাড়ির প্রকাণ্ড গেট নির্মম সূর্যের আলোয় যেন সত্যেনের সমস্ত দৈন্য মূর্ত করে দিল। কেমন করে দাঁড়াবে ও এ বাড়ির সৌখীন কর্তার সামনে! নাঃ, যেমন করে হোক্ কয়েকটা বড়ো বড়ো 'পলিসি' ওকে করাতেই হবে এবার। পোশাকের সংশোধন না করলেই নয়। কী ময়লা হয়েছে সার্টের কলার! ময়লা ঢাকবার জন্যে কোটের কলার তুলে দিলো সত্যেন। এদিক-ওদিক চেয়ে জুতোটাও পরিষ্কার ক'রে

নিলো। অভদ্রভাবে ভদ্রলোকের সামনে তো আর যাওয়া যায় না।

কার্ড? দারোয়ান সামনে দাঁড়ালো। এগিয়ে দিল কার্ড সত্যেন।…

একটু পরে ঘুরে এসে দারোয়ান জানালো, সাহেব বড় ব্যস্ত, দেখা হবে না:

কবে আসবো?

মালুম নেই, দারোয়ানের কর্কশ কণ্ঠস্বর বাজলো!

আবার পথ!

সূর্যের উজ্জল বর্শা ছিন্ন করেছে কুয়াশাকে। প্রাণের সাড়ায় শীতের ক'লকাতা চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। ট্রামের আওয়াজ, মোটরের হর্ন, জনতার কোলাহল মুখর করেছে রাজপথ। পথ চলতে চলতে সত্যেনের মনে হ'লো সে যেন একমাত্র ব্যতিক্রম। প্রাণের এই সজীব সাড়ায় তাল মেলাবার ইচ্ছে আর অবসর—দু'য়ের কোনটাই তার নেই। রুক্ষ শুষ্ক বন্ধ্যা ওর অন্তর। কেবলই মনে মনে সে উচ্চারণ করে, এ মোহে ভুলো না! সবাইকে চিৎকার ক'রে সতর্ক করতে চায় সত্যেন। নিজে প্রতিমুহূর্তে কান পেতে থাকে। আসছে—হ্যাঁ, সত্যেন লক্ষ্য করে নিরন্তর. কেবলই এগিয়ে আসছে সেই নির্মম ভয়ংকর দস্যু সমস্ত সুখ-শান্তি সাধ আহ্লাদ লুঠ ক'রে নিতে। তার পায়ের শব্দ হয় না—চোরের মতো সে এগিয়ে আসে! সাবধান করতে চায় সকলকে সত্যেন। মৃত্যুকে শাসন করা তার কাজ। আনন্দে সাড়া দেবার সময় তার নেই।

কিন্তু এক কাপ চা হ'লে বেশ হ'তো, গলাটা শুকিয়ে গেছে সত্যেনের। কাছেই রেস্তোরাঁ। অনেকের ভিড় সেখানে, চায়ের ধোঁয়া উড়ছে—কিন্তু পকেট শূন্য। আবার ভালো করে খুঁজে দেখলো সত্যেন—নাঃ, একটি পয়সাও আর অবশিষ্ট নেই। যাক্ গে, চা না হ'লেও তার চলবে।

এবার তাকে যেতে হবে একটু দূরে, আরেক ভদ্রলোকের বাড়ি। হেঁটেই চলে যাবে সে। মাঝে মাঝে হাঁটা ভালো।

এই অবসরে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিলো সে। তারপর কোনদিকে না চেয়ে কোম্পানীর ব্যাগটাকে সজোরে চেপে ঘাড় গুঁজে সত্যেন পথ চলতে লাগলো।

সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জগৎ আঢ্যের সামনে দাঁড়িয়ে তার সর্বপ্রথম মনে হ'লো যদি এক কাপ চা পাওয়া যেতো এসময় তাহ'লে অনেক ভালো করে সে কথা বলতে পারতো। আকণ্ঠ পিপাসায় তার বুক চিরে যাচ্ছে।

বসুন, আঢ্য বললেন, কী বিষয়ে কথা বলতে চান আমার সংগে ?

পরপর কয়েকটা ঢোঁক গিলে সত্যেন বললো, আমি একটা বিশেষ কাজে আপনার কাছে এসেছিলাম, মানে—

বলুন।

দেখুন জগৎবাবু, মানুষকে দিয়ে জোর করে কোন কাজ করিয়ে নেয়া যায় না আর সেটা আমি ভালোও বাসি না—

একটু সংক্ষেপে বলুন, আমার কাজ আছে।

আপনি সুপ্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী—আপনার অসীম গুণের কথা আজ আর কারোর অজানা নেই—

ওসব কথা থাক, গম্ভীর মুখে আঢ্য বললেন।

যখন আপনার বয়স হবে, আপনি বিশ্রাম চাইবেন তখন আপনার কাজের সমস্ত ভার আপনি কার ওপর দেবেন ?

কেন, আমার ছেলেদের ওপর, কিন্তু সে সব কথায় এখন দরকার কী ? অন্য কথা থাকে তো বলুন, আমার সময় বড়ো অল্প।

সেকথা কানে না তুলে সত্যেন বললো, কিন্তু আপনার ছেলেরা তো আপনার মতো কঠোর পরিশ্রমী হ'তে পারবেন না—

কেন পারবে না ? জগৎ আঢ্য অবাক হ'য়ে বললেন।

তাঁদের বয়স অল্প—

অল্প বয়সে পরিশ্রম না করলে কী বুড়ো বয়সে করবে মশাই ?

না না সে কথা বলছি না, সত্যেন খেই হারিয়ে ফেললো, ঈশ্বর না করুন, কিন্তু প্রত্যেকের জীবনে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, তাই আমি আপনাকে অনুরোধ করছিলাম যে আপনার পারিবারিক মংগলের কিছুটা ভার যদি আপনি আমাদের কোম্পানীর ওপর ছেড়ে দেন—

কী কোম্পানী আপনাদের ?

দি গ্রেট লাইফ ইনসিওরেন্স—

বুঝতে পেরেছি, দেখুন আমি ওসব করবো না।

আপনি একথা বললে আমরা যাই কোথায় স্যার ?

কেন করবো বলুন ? আপনাদের কোম্পানীতে যে টাকাটা ফেলে রাখবো সেটা ব্যবসায় খাটালে তার চতুর্গুণ লাভ আমার হবে।

কিন্তু ব্যবসাটা ভাগ্যের খেলা স্যার।

পরিশ্রম মানুষের ভাগ্য গড়ে বুঝলেন মশাই, নিজের লাভ আমাকে দেখতে হবে তো !

সে তো ঠিক, ইতস্তত ক'রে সত্যেন বললো, কিন্তু স্যার, আমাদের কোম্পানী—

আমার ব্যবসা আমাকে যা দেবে, আপনার কোম্পানী তার সিকি ভাগও দেবে না, আর দেখুন, ইনসি ওর করবার হ'লে আমি অনেক আগেই করতাম—আপনার আগে আরও বহু লোক আমার কাছে এসেছিলো—

আঢ্যকে চাকর চা দিয়ে গেল। সত্যেনের গলা জ্বালা ক'রে উঠলো। মন্ত্রচালিতের মতো তার হাতটা উঠেই নেমে গেলো। ভদ্রলোক চা পান করতে লাগলেন।

শীর্ণ গলিটা পেরিয়ে সত্যেন নিজের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো।

ওর গা ঘিনঘিন করে উঠলো বাড়িটা দেখে। পচা স্যাঁতস্যাঁতে নোংরা দুটো ঘর ভেসে উঠলো ওর চোখের সামনে। থম থম করছে বাড়িটা। মৃত্যু যেন সেখানে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। ঘরে প্রবেশ করে সত্যেন কাপড় বদলাতে লাগলো।

এলে ? সুষমার ক্ষীণ কণ্ঠস্বর বাজলো।

খোকা কেমন আছে ?

ভালো নেই, জ্বর অনেক, একটু থেমে সুষমা বললো, ডাক্তারের কাছে যাওনি ?

গিয়েছিলাম, মিথ্যা কথা বলতে সত্যেনের বাধলো না, কাল আসবে বলেছে, তক্তপোষের কাছে ঝুঁকে পড়লো ও, নাঃ, বেশি জ্বর নেই।

বাবা, তিন বছরের খুকি এগিয়ে এলো, ক্ষিদে পেয়েছে—

ভাত খাসনি

না, মা দেয়নি।

বিস্মিত হ'য়ে সত্যেন জিজ্ঞেস করলো, তোমার খাওয়া হয়নি এখনো

ম্লান হাসি হাসলো সুষমা, চাল তেল নুন একেবারেই নেই, তোমাকে কবে থেকে বলছি মাসকাবারি বাজারের কথা—

তবে কী রান্না হয়নি এবেলা ? সত্যেনের কণ্ঠস্বর কাঁপছে।

সুষমা উত্তর দিলো না, মুখ নিচু করে রইলো।

বাড়িওলা এসেছিলো, একটু পরে সুষমা আস্তে আস্তে বললো, বাইরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে গেল খুব, আসছে মাস থেকে বাড়ি খালি করে দিতে হবে।

ওরা অমন চেঁচায়, সত্যেন হেসে ফেলে বললো।

বাবা বাবা, মন্টু ছুটে এলো।

কী রে, তুই এখুনি এলি যে !

আমায় ইস্কুল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে—

কেন ?

অনেক মাসের মাইনে দি'নি কিনা, কী মজা, সারাদিন খেলতে পাবো, ছুটে বেরিয়ে গেল মন্টু।

একটু চুপচাপ !

সারা ঘরখানার হাওয়া যেন বিষাক্ত হয়ে উঠলো। সত্যেনের মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠলো। এঘরে নিজেকে কিছুতেই ও মানিয়ে নিতে পারছে না। ও কী এখুনি পড়ে যাবে ?

মন্থর পদক্ষেপে পাশের ঘরে চলে এলো সত্যেন। আঃ—মুক্তির নিশ্বাস ফেললো সে। তক্তপোষে নিশ্চিন্তে গা এলিয়ে দিলো। এখানে যেন তার কোন দায় নেই। একেবারে মুক্ত সে।

সত্যেন ভাবছিলো একটা মোটা রকমের পলিসির কথা। ডাক্তার রায়ের কাছে আজ বিকেলে তাকে যেতেই হবে।

সত্যেনের কথা বলার ধরনটা বড়ো পুরানো হয়ে গেছে। একটু নতুন করে কথা বলতে হবে সেখানে। হাজার হলেও ডাক্তার রায় সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক। নতুন ধরনের কথা না শুনলে তিনি আকৃষ্ট হবেন কেন !

যদি বলা যায়, আপনি সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক, আপনাকে কিছু বলার ধৃষ্টতা

আমার নেই ডাক্তার রায়, মৃত্যুর সংগেই আপনার কারবার। নিঃশব্দে চোরের মতো আপনার সংসারের ওপর মৃত্যু কখন ছায়া ফেলবে কে জানে! তাই একজন সাধারণ লোক হিসেবে আমি শুধু আপনাকে সতর্ক করতে চাই—আপনার সংসার যেন কখনো তছনছ না হয়, আপনার ছেলেমেয়েরা যেন কখনো না দুঃখে পড়ে! ছেলেমেয়েদের সুখ, সংসারের শ্রী, স্বাচ্ছন্দ যে দেখে সেই তো পিতা—কর্তব্যপরায়ণ পিতা! জানেন তো ডাক্তার রায়, হ্যাঁ, পরিশেষে দু' লাইন কবিতা যোগ করে দিলেই হবে, জীবনের পিছে মরণ দাঁড়ায়ে, আশার পশ্চাতে ভয়·········

শুক্রবার সকাল ঃ ১৫ই পৌষ, ১৩৫০ ঃ কলিকাতা।

উপজীবিকা

একটা ভাল্লুক, ছাগল, দুটো বাঁদর, কালু আর স্ত্রী রাধু—এই নিয়েই যজ্ঞেশ্বরের সংসার।

কিন্তু সংসার তার চলে না। হয়তো আরও অচল হ'তো, যজ্ঞেশ্বর মনে মনে জানে, যদি তার ভাল্লুক বুধি না থাকতো। তার ওপর যজ্ঞেশ্বরের বেশ একটু মায়া পড়ে গেছে বৈকি!

রাধুর এতটা বাড়াবাড়ি ভাল লাগে না। হাজার হলেও একটা জানোয়ার তো। তাকে ওরকম করে মাথায় তোলবার কি দরকার।

বুধির থেকে থেকে জ্বর আসে—সেটা প্রায় প্রতিদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে, আর জ্বর এলেই যজ্ঞেশ্বর কেমন যেন দিশেহারা হয়ে যায়। রাধু অনেক সহ্য করেছে কিন্তু একদিন তার রক্ত সত্যিই গরম হয়ে উঠলো।

আমার চাদরটা তুমি ওর গায়ে দিলে, বলি কি আক্কেল তোমার গো, য়্যাঁ?

আহা, জ্বর এলো যে বেচারার!

হোক জ্বর, আমার চাদর কেন তুমি ওর গায়ে তুললে শুনি?

আর যে নেই।

মরণ আমার, রাধু প্রায় কেঁদে ফেললো, একটা কাপড় দেবার ক্ষমতা নেই, খালি ভাল্লুক ভাল্লুক আর ভাল্লুক, বুধির দিকে সে একটা কাঠ ছুঁড়ে মারলো।

আহাহা লাগবে যে!

ননীর পুতুল! লাগবে তো আমার ভারী বয়েই গেল—কালো হুঁৎকো জানোয়ার কোথাকার!

ও একদিন না থাকলে খাওয়া জুটবে না জানো—তখন খুব ভাল হবে য়্যাঁ?

খাওয়া জুটবে না, মুখ ভেঙিয়ে রাধু বললো, ছাগলটা আর বাঁদর দুটো আছে না?

উঃ, ভারী ওদের কেরামতি রে! বুধি না থাকলে আর কর্‌করে কাঁচা পয়সা ঘরে আনতে হোত না। ওই তো রামেশ্বর বাঁদর আর ছাগলী নিয়ে

খেলা দেখাতে বার হয়, তার বৌ তোমার কাছে আসে না রোজ রোজ পয়সা ধার করতে ?

আর ভাল্লুক নিয়ে তুমি রাজা হয়ে গেছ না ? আমার রুপোর চুড়ি-গুলো সেবার কালুর অসুখের সময় বেচতে হ'লো না ?

বুধি না থাকলে তোমাকেও বেচতে হতো রাধু।

হুঁঃ ? চল না বুধির বদলে এবার আমাকে নাচাবে রাস্তায়—আরও বেশি পয়সা ঘরে আসবে।

জিব কেটে যজ্ঞেশ্বর বললো দূর তাকি পারি !

সকাল বেলা ঘুমন্ত যজ্ঞেশ্বরের মাথার কাছে এসে বুধি ঘোঁৎ করে শব্দ করে—তাইতেই তার ঘুম ভেঙে যায়।

কিরে বুধি, এ বুড়িয়া ?

কিন্তু বুধি উত্তর দেবার সময় পায় না, রণচণ্ডীর মতো রাধু সেখানে এসে উপস্থিত হয়।

ফের্ ঘরে ঢুকেছিস হারামজাদা—তার কথা শেষ হবার আগেই বুধি সেখান থেকে সরে পড়ে।

আঃ, সকাল বেলা দূর দূর কর কেন বেচারাকে ?

কাঁদো কাঁদো হয়ে রাধু বললো, আর পারি না বাপু জানোয়ারের সেবা করতে, তুমি এ পেশা ছেড়ে দাও, আজকাল বড় ঘেন্না করে আমার—

ওতো তোমার ছেলে রাধু।

মরণ আর কি, নিজের পেটের ছেলের কাপড় নেই, তাকে একখানা কাপড় দিতে পারো না ?

কালুর কাপড় না সেদিন কিনে দিলাম।

এই সেদিন হ'লো ? সেটা গেল বছর পূজোর সময় না ? এবেলা মনে থাকে না ? এ নিজের ছেলে কি-না ! হতো ভাল্লুকের কম্বল যেমন করে হোক, দু'দশটা কিনে দিতে—রাধু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বাইরে এসে যজ্ঞেশ্বর প্রথমে ভাল্লুকটাকে আদর করলো। তারপর মুখ ধুয়ে এক বাটি চা নিয়ে বসলো। অবশেষে কালুকে ডেকে বাঁদর ভাল্লুক আর ছাগল নিয়ে ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে বেরিয়ে গেল।

কালু যজ্ঞেশ্বরের একমাত্র ছেলে। বাপের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়ায় সে।

যজ্ঞেশ্বর তাকে রোজই বলে, বুড়ো হয়ে গেলাম, আর তো বেশি দিন নয়, এবার তোকে একাই বেরোতে হবে কালু—

সব খেলা দেখাবো, দাও না বাবা আজকেই।

জিব বের করে যজ্ঞেশ্বর বললো, না না আজ নয়, এখনো তুই ছোট আছিস কিনা, আরও কিছুদিন ঘোর্ আমার সঙ্গে তারপর দেবো একেবারে তোর হাতেই ছেড়ে—

বুধি আমার কথা শুনবে তো বাবা ?

সেই তো মুশ্‌কিল কালু, আমি ছাড়া ও কারুর কথা শোনে না যে—

এই খেলা দেখাও—এই বাঁদরওলা—

ছেলেমেয়েদের শেষের বিশেষণটা শুনে যজ্ঞেশ্বর বিশেষ খুসী হয় না। বাঁদর ছাড়া কি তার আর কিছুই নেই ? এই প্রকাণ্ড ভালুকটা প্রত্যেকের চোখে পড়ে না কেন ! সে বাঁদর ওয়ালা নয়, তাকে বলা উচিত ভালুকওয়ালা। এইজন্যে তার বেশ গর্ব ছিল মনে মনে। তাদের বস্তীতে বাঁদর তো অনেকেরই আছে কিন্তু ভালুক ?—

ছেলেমেয়েদের দিকে চেয়ে যজ্ঞেশ্বর বললো, এর নাম বুধি, পয়সা না দিলে খেলা দেখাবে না। এই দেখ কত বড় ভালুক—কিরে বুধি বিনি পয়সায় নাচ দেখাবি ?

ঘোঁৎ করে একটা শব্দ করে বুধি আপত্তি জানালো।

খোকা পয়সা দাও ?

কত পয়সা নেবে তুমি ?

এক টাকা, একটা বাড়ির গেটের সামনে তখন যজ্ঞেশ্বর আসর সাজিয়ে বসেছে।

এক টাকা ! ছেলেমেয়েদের মুখ কালো হয়ে গেল, অত পয়সা তো নেই—ওদিকে যজ্ঞেশ্বরের ডুগডুগি শুনে লোক জমতে আরম্ভ করেছে।

সাধারণত এমনি উপযাচক হয়ে যজ্ঞেশ্বর খেলা দেখায় না। কিন্তু সব দিন সমান যায় না। আজ বাড়ি যাবার আগে বেশ কিছু পয়সা তুলতে না পারলে মুশ্‌কিল হবে।

এই গুপি, বড় বাঁদরটার দড়িতে টান মেরে সে বললো, বিয়ে করবি, খুব সুন্দরী বউ হবে তোর—গুপি যেন আনন্দে ঘুরে ঘুরে নাচতে আরম্ভ করলো।

এঃ বড় ফুর্তি, নাচতে লেগে গেলি যে, আয় তুই টুনি বিয়ে করবি আয় —টুনি কিন্তু নড়লো না, মাথা নীচু করে লজ্জায় আর একটু দূরে সরে বসলো।

ওঃ, আরোও জোরে ডুগডুগি বাজিয়ে যজ্ঞেশ্বর বললো, ছুঁড়ির লজ্জা হয়েছে, আয় আয়, বর দেখবি আয়, এই নে জামা পরে নে—

অনেক আয়োজন করে যজ্ঞেশ্বর দর্শকদের সামনে বিবাহ-পর্ব দেখাতে লাগলো। ছাগলের পিঠে চড়ে বর যখন বিয়ে করতে যাচ্ছে তখন ওপরে চোখ তুলে সে দেখলো মেয়েরা খিল খিল করে হাসছে।

বিবাহ-পর্ব শেষ হবার পর যজ্ঞেশ্বর থালা বাড়িয়ে ধরলো—এবার পয়সা দিতে হবে।

সকলে কোলাহল করে উঠলো, ভাল্লুক নাচ দেখাও তারপর পয়সা—

মৃদু হেসে যজ্ঞেশ্বর বল্‌লে, আগে পয়সা না পেলে ভাল্লুক নাচবে না।—

বুধির ওঠবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

ফেলুন বাবু টাকা, আট আনি, বাড়িয়া খেল হবে—বাড়িয়া খেল—

দর্শকদের সংখ্যা বেশ কমে এলো। বাকি যারা ছিল তাদের মধ্যে কয়েকজন থালাটায় পয়সা ছুঁড়ে দিল। থালা সামনে নিয়ে যজ্ঞেশ্বর দেখলে মাত্র চৌদ্দ আনা উঠেছে। কাজেই ভাল্লুকের খেলা খুব তাড়াতাড়ি সারতে হবে।

এই বুধি আ যাও, বাবুদের নাচ দেখলাও, বিলাইতি বোল্ ডেন্স—জোরে ডুগডুগি বেজে উঠলো। তালে তালে বুধি নাচতে আরম্ভ করলো। এর পর তার সঙ্গে যজ্ঞেশ্বর কুস্তি করে—সেটাই তার আসল খেলা। কিন্তু সে-খেলা আজও দেখালো না, কেন না বুধির বিলাইতি বোল্ ডেন্সের দাম ওঠেনি।

যজ্ঞেশ্বরের বাড়ি ফিরতে বেশ বেলা হয়ে যায়। ভাল্লুকটার মুখ দিয়ে তখন ফেনা ঝরে, বাঁদর দুটো যেন আর চলতে পারে না, ছাগলটাকেও জোর দিয়ে টেনে নিয়ে যেতে হয়।

কালু আর যজ্ঞেশ্বরকে খেতে বসিয়ে বাঁদর ভাল্লুক আর ছাগলটাকে রাধু নিজের হাতে যত্ন করে খাওয়ায়। না খাইয়ে উপায় আছে কি, যজ্ঞেশ্বর মনে মনে ভাবে, রাধু কি আর জানে না যে এরা না থাকলে তার নিজেরই

খাওয়া জুটবে না। কিন্তু এখন তার অবসর বড়ো কম। আবার ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে সে বেরিয়ে পড়ে।

বুধিকে পাওয়ার পর যজ্ঞেশ্বরের অবস্থা ফিরে গেছে। আজকাল তাদের দুবেলা পেট ভরে খাওয়া জোটে। বস্তিতে আর যে সব বাঁদরওয়ালা আছে তাদের অবস্থা দেখলে যজ্ঞেশ্বরের দুঃখ হয় কিন্তু রাগও হয় তার। কে না হিংসা করে তাকে আজ? তার ভাল্লুকটা যেন প্রত্যেকের দু চোখের বিষ!

রাস্তায় চলতে চলতে মাঝে মাঝে যজ্ঞেশ্বরের পুরানো কথা মনে পড়ে যায়—যখন টাকা ধার চাইবার জন্যে যার তার কাছে ঘুরতে হতো। অতীতের সেই সব দারিদ্র্য-কণ্টকিত দিনের কথা স্মরণ করে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সে বুধির দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা ভাল্লুক তার সে-অভাব পূর্ণ করেছে। এর চেয়ে বড়ো বন্ধু তার কে!

সন্ধ্যাবেলা যজ্ঞেশ্বরের প্রচুর অবসর। বুধিকে একটা বিড়ি খাইয়ে প্রায় ভরিখানেক আফিং খেয়ে সে ঝিমুতে থাকে। আর সেই সময় তার অনেক কথা মনে পড়ে যায়। বাইরে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার থম্‌থম্ করে। নানা কণ্ঠের কোলাহলে সমস্ত বস্তি মুখর হয়ে উঠেছে। ছেঁড়া খাটিয়ায় যজ্ঞেশ্বর চিৎ হয়ে পড়লো।

এই রাধি—রাধু—

কী? চেচাঁচ্ছ কেন ষাঁড়ের মতো?

এদিকে আয়, শোন্ না—

ফের্ তুই তোকারি? একি বুধি নাকি?

আহা চটো কেন, বুধি কি তোমার সতীন নাকি?

সতীনের বাড়া!

ওকে পাবার আগে, থেমে থেমে যজ্ঞেশ্বর বলতে থাকে, মনে আছে রাধু, খাওয়া জুটতো না; কালুর যেবার বসন্ত হয়—

হ্যাঁ হ্যাঁ, তা হয়েছে কী?

এখনো প্রত্যেকটি কথা রাধুর মনে আছে! কালুর বাঁচবার কোন আশাই ছিলো না। ঘরের সামান্য জিনিস-পত্র যা ছিল তখনই বিক্রি হয়ে যায়। বড়ো দুঃখে দিন গেছে তখন।

তাই বলছিলাম, যজ্ঞেশ্বর বলে, বুধি পয়সা আনে রে. তার তখন বেশ

নেশা ধরেছে, মানুষের থেকে বেশি দাম ওর। বুধি না থাকলে আমার কী হতো, তোর কী হতো, আর কাল্লু তো:যেতেই বসেছিলো—নেশায় অভিভূত হয়ে পড়লো যজ্ঞেশ্বর।

সে এক ছোটোখাটো ইতিহাস বৈকি। আর তারপর থেকেই যজ্ঞেশ্বরের ভগবানে বিশ্বাস বেড়ে গেছে। বুধিকে তার ঈশ্বরের দূত বলে মনে হয়।

পার্কের সামনে বসাকদের বিরাট বাড়িতে যজ্ঞেশ্বর আগে অনেকবার বাঁদর নাচ দেখিয়েছে। সে-বাড়ির কৌতূহলী ছেলের দল তার সঙ্গে আলাপ করেছে, তাকে পয়সা দিয়েছে, বাঁদরকে কলা খাইয়েছে। কিন্তু বহুবার সে এ বাড়িতে নাচ দেখিয়ে পয়সা নেয় নি—এর পেছনে তার এক বড়ো উদ্দেশ্য ছিল। বসাক-বাড়ির ছোটোখাটো চিড়িয়াখানার ভাল্লুকটার দিকে সে আড় চোখে অনেকবার তাকিয়েছে আর মনে মনে অনেক কল্পনা করে স্বপ্ন দেখেছে।

একদিন:বুড়ো বসাক বললেন, ওহে তুমি নাচ দেখাও পয়সা নাও না, গরীব মানুষ তুমি, এ আবার কি হুঃ ?

মাথা চুলকে যজ্ঞেশ্বর বলেছিলো, হুজুরের ছেলেরা যে নাচ দেখেন সেই তো যথেষ্ট।

না না, এ তোমার ব্যবসা !

হুজুর দয়া থাকলে ব্যবসা আমার ঠিক চলবে, যজ্ঞেশ্বর ভক্তিতে গদগদ হয়ে পায়ের ধূলো নিয়েছিলো বুড়ো বসাকের।

হাঁ হাঁ করে উঠে বুড়ো বসাক বলেছিলেন, কর কি, কর কি, আমার পায়ের ধূলো—

হুজুর মা-বাপ !

যজ্ঞেশ্বর ডুগডুগি বাজিয়ে হাসতে হাসতে চলে গিয়েছিল। যদি কোন রকমে একটা ভাল্লুক পাওয়া যায়।

দারোয়ান চৌবেকে একদিন খইনি খাইয়ে সাহস করে যজ্ঞেশ্বর কথাটা বলে ফেলেছিলো, ওহে দারোয়ানজি, তুমি তো এ বাড়ির সব—সাহস করে একটা কথা বলবো ?

বল্ না ভয় লাগে কেন ?

ওইতো অতোগুলো ভাল্লুক রয়েছে, বাবুকে বলে আমাকে দাওনা একটা —মাসে মাসে পয়সা দেবো।

আরে চুপ চুপ পয়সার কথা বলিস না, দেখ্ বাবুর ইচ্ছে নয় একদম ভাল্লুক রাখে, দাদাবাবুর সঙ্গে রোজ ঝগড়া হয়—

বলবো না কি বাবুকে ?

বল্না দাদাবাবু বেরিয়ে গেলে, তবে এ বুদ্ধু দামের কথা বলিস না, শুন্ কথা, আমাকে দাম দিবি কিছু, পঁচিশ টাকা দিবি ?

অতো টাকা কোথায় পাব দারোয়ানজি, গরীব মানুষ আমি—

তবে শালা বাঁদর নাচ দেখা—যা ভাগ !

আচ্ছা বাপু দেবো, তুমি যখন বলছো—

তারপর এই ভাল্লুক ! আশ্চর্যভাবে যজ্ঞেশ্বর হঠাৎ বুধিকে পেয়ে যায়। আর ঠিক যেন মন্ত্রের মতো কাজ হলো। তার পয়সা ধার করবার প্রয়োজন মিটলো, পেট ভ'রে দু'বেলা খাওয়া জুটলো। ভগবানের দূত ছাড়া যজ্ঞেশ্বরের কাছে বুধি আর কি !

একদিন সকাল বেলা যজ্ঞেশ্বর কিছুতেই বিছানা ছেড়ে উঠতে পারলো না। তার মাথা ঘুরছে, গায়ে অসহ্য ব্যথা, বোধহয় জর হয়েছে।

এই রাধি—রাধু ?

কী বলছো ?

আমার কি জর হয়েছে নাকি ?

য়্যাঁ, যজ্ঞেশ্বরের গায়ে হাত দিয়ে রাধু শিউরে উঠলো, ইস্ কী গরম, গা যে পুড়ে যাচ্ছে !

হ্যাঁ জর হয়েছে, তবে তো মুশ্কিল হ'লো।

কেন, মুশ্কিল কিসের ?

আজ তো বেরোতে পারবো না, হাতে তো পয়সা নাই তোমার, না ?

না গো, একটাও পয়সা নাই, কিন্তু মুশ্কিলের কি আছে ? কালু যাবে খন ?

পাগল নাকি ? হেসে যজ্ঞেশ্বর বললো, কালু কেমন করে যাবে বুধিকে নিয়ে ?

কেন যাবে না ? অতো বড়ো ছেলে, এতোদিন ঘুরলো তোমার সঙ্গে—

না না, শেষে—তার চেয়ে ও বাঁদর আর ছাগল নিয়ে যাক্।

কালু সামনে এসে বললো, বাঁদর নাচ কেউ দেখতে চায় না বাবা। খুব পারবো আমি বুধিকে নাচাতে—আজকাল আমার কথা শোনে বেশ।

হ্যাঁ হ্যাঁ তাই যাক্‌, রাধু বলে উঠলো, বাঁদর দিয়ে গেলে কেমন করে চলবে ? তোমার অসুখ, সাবু-টাবু আসবে তো, বেশি পয়সা না উঠলে—

কিরে কালু পারবি ?

খুব পারবো বাবা, একলাফে বেরিয়ে গিয়ে কালু ডাকলো, বুধি, এই বুধি আয় আয়—

বুধি আপত্তি করলো না, নিঃশব্দে এগিয়ে এলো। মহা উৎসাহে ডুগডুগি বাজাতে বাজাতে কালু বেরিয়ে গেল।

যজ্ঞেশ্বর একবার মাথা তুলে ওদের দিকে দেখবার চেষ্টা করলো। শেষ অবধি কালু যদি বুধিকে সামলাতে না পারে তাহ'লে একটা বিপদ হবে। মৃদু অস্বস্তিতে ওর মন ভ'রে রইলো।

রাধু কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, কী খাবে তুমি এখন ? মুড়ি-টুড়ি তো আজ খেতে পাবে না !

ভেঙে ভেঙে যজ্ঞেশ্বর বললো, ক্ষিদেও নেই একেবারে, শুধু এক বাটি চা ক'রে দাও।

পয়সাও নাই যে হু'টো বিস্কুট কিনে আনি, গজ্‌গজ করতে করতে রাধু উনুনের ধারে গেল।

না না কিছু দরকার নেই, শুধু চা-ই দাও না, মাথার যন্ত্রণায় নির্জীবের মতো পড়ে রইলো যজ্ঞেশ্বর।

আসন্ন শীতের মৃদু আমেজে শেষ শরতের সকাল সজীব মন্থরতায় ভরে উঠেছে। হঠাৎ-আসা প্রাকৃতিক আলস্যের মাঝেও সমস্ত বস্তিতে কাজের চাঞ্চল্য পড়ে গেছে। অনেক দূর থেকে এখনও কালুর ডুগডুগির আওয়াজ শোনা যায়। যজ্ঞেশ্বর ঝিমিয়ে পড়লো।

হঠাৎ বস্তির কে একজন ছুটতে ছুটতে এসে বলে গেল, সবসুদ্ধ চাপা পড়েছে, শীগগীর যা যজ্ঞেশ্বর—

যজ্ঞেশ্বরের সমস্ত শরীরে যেন প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক ধাক্কা লাগলো। তার মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠলো—চারপাশ যেন ঘন অন্ধকারে ভরে গেছে।

রাধু চিৎকার করে উঠলো, কালু, আমার কালু—

বুধি—বুধি বেঁচে আছে তো—লাফ দিয়ে বিছানা ছেড়ে যজ্ঞেশ্বর ছুটে বেরিয়ে গেল। তার মাথার ঠিক নেই।

বেশি দূর তাকে ছুটতে হলো না, কাছেই দুর্ঘটনা ঘটেছে। একটা মিলিটারী লরীও দেখা যাচ্ছে। তবে তো সর্বনাশ, আর কোন:আশা নেই, বুধি নিশ্চয়ই গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে।

বুধি—বুধিয়ারে—উদ্‌ভ্রান্ত যজ্ঞেশ্বর ঘটনাস্থলে এসে চিৎকার করে উঠলো। কিন্তু ভগবান রক্ষা করেছেন, দূরে অক্ষত বুধিকে দেখা যাচ্ছে। পরম নিশ্চিন্তে উন্মাদের মতো যজ্ঞেশ্বর সেই ভাল্লুককে জড়িয়ে ধরলো।

চাপা পড়েছে কালু। ভিড় ঠেলে রক্ত মাখা মৃত দেহের ওপর আছাড় খেয়ে যখন যজ্ঞেশ্বর চিৎকার করে কেঁদে উঠলো, সহানুভূতির ছলছল চোখে বুধি তখন তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

বাঁদর দুটো অনেকদিন পর ছাড়া পেয়ে এ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছুটে বেড়াচ্ছে। আর ছাগল? পাশের মাঠে তাজা সবুজ ঘাস—সেই ঘাসে তখন সবে মুখ দিয়েছে।

সোমবার সকাল : ১৮ই কার্তিক, ১৩৪৭ : কলিকাতা

হয় তো কিছুই নয়।

বিশাল পৃথিবীর অসংখ্য সংকীর্ণ ঘরে কতো লোক নিঃশেষে শেষ হয়ে যায়—কে তার হিসেব রাখে! মানুষের জীবনে দু চার জন পরিচিতের বীভৎস মৃত্যু হয়তো কিছুই নয়।

তবু কিছুতেই হরিশঙ্করবাবু বিস্মৃতির যবনিকা নামিয়ে আনতে পারেন না। আজও মাঝে মাঝে তার রক্ত যেন জ্বলে ওঠে। একটা রুদ্ধ আক্রোশ তার সমস্ত শিরা উপশিরায় স্থির বৈদ্যুতিক শক্তির মতো জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

দুঃসময়ের দরুন অনেক গণ্ডী পেরিয়ে কথনও কথনও হরিশঙ্করবাবু মনে মনে অতীতের তীরে এসে দাঁড়ান।

* * *

যুদ্ধ তখনো বাধেনি।

স্ত্রী, একটি মেয়ে আর হরিশঙ্করবাবু—এই নিয়েই সংসার। সুতরাং অভাব হবার কথা নয়। হরিশঙ্করবাবু নিশ্চিন্তে নিশ্বাস নিতেন। স্ত্রী মহালক্ষ্মী অর্থের স্বল্পতায় অভ্যস্ত, তারও কোন অভিযোগ ছিলো না।

মাঝে মাঝে মহালক্ষ্মী বলতো, ওগো এ মাসে বড় টানাটানি, তোমার বিড়ির খরচটা বাদ দিতে পারো না?

হরিশঙ্করবাবু রেগে উঠতেন, ওই একটিই তো আমার নিজের খরচ, সেটা ছাড়া অন্য কোন খরচ কমাতে পারো না তুমি?

কোনটা কমাবো তুমি ব'লে দাও? নিজের হাতে সব নিয়ে দেখ না তুমি, কতো ধানে কতো চাল বুঝবে তখন।

আমার ভারী বয়ে গেছে বুঝতে, একটা বিড়ি ধরিয়ে হরিশঙ্করবাবু বলেন, তবে হ্যাঁ, বিড়িটা আমি ছাড়তে পারব না বাপু—

বেশ, খুকু তাহ'লে জামা না প'রে থাকুক, আমার কি, মহালক্ষ্মী রেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

আর একদিন হরিশঙ্করবাবু বলেন, আর তোমাকে ভাবতে হবে না লক্ষ্মী, রাত্তির বেলা একটা মাষ্টারী পেয়েছি, দশ টাকামাইনে—

খুকু এসে বলে, আমাকে একটা পুতুল দেবে বাবা ?

যা এখন এখান থেকে, মহালক্ষ্মী ধমকে ওঠে, তুমি ভেবেছো কি, সারাদিন খেটে খুটে এসে আবার রাত্তির বেলা চাকরি, না আমি বলে দিলাম ওসব হবে টবে না।

তা না হ'লে খুকুর জামা—

হ্যাঁ বাবা, আমার সব জামা ছিঁড়ে গেছে।

তুই থাম খুকু, মহালক্ষ্মী বলে, খুকুর জামার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না, কিন্তু তোমার ও মাষ্টারি নেওয়া চলবে না।

খুকুকে কোলে তুলে নিয়ে হেসে হরিশঙ্করবাবু বলেন, তোমার সব জামা ছিঁড়ে গেছে ? আহা হা—খুকু—খুকুমণি—

যুদ্ধ বাধলো।

সেই যুদ্ধে সমস্ত পৃথিবীর কি ক্ষতি আর কতটা লাভ হ'লো সেকথা জানবার অবসর হরিশঙ্করবাবু পেলেন না। তিনি যেন সমূলে ভেঙ্গে পড়লেন। কোথাও আলো নেই, চার পাশে নিঃসীম অন্ধকার। সংসারের দৈনন্দিন যুদ্ধে হরিশঙ্করবাবু ভীষণভাবে হেরে গেলেন।

ওগো কি হবে ? মহালক্ষ্মীর ক্লান্ত স্বর ভাসে, এতো দাম জিনিসের, কিছুই যে আমি কিনতে পারি না।

আমি আর ভাবতে পারি না লক্ষ্মী, আমাকে রেহাই দাও।

আমরা না হয় না খেয়ে রইলাম, কিন্তু খুকুমণি ? তার খাওয়ার কষ্ট তো আর দেখতে পারি না।

হরিশঙ্করবাবুর বুকের ভেতরটা জ্বলে যায়। তাঁর এক মাত্র মেয়ে, ছোটো সংসার—এরই ভার বহন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়।

খুকুমণি, খুব আস্তে তিনি ডাকেন।

কী বাবা ?

খুকুকে কোলে তুলে নিয়ে হরিশঙ্করবাবু বলেন, কিরে খুকু ? খুকুমণি—তোর কিছু নেই না ? জামা নেই, দুধ নেই, খেলনা নেই—নারে খুকু ?

খুকু বলে, আমার মা আছে, বাবা আছে, আমার সব আছে বাবা।

হরিশঙ্করবাবু খুকুকে বুকে চেপে ধরেন। বাইরের পৃথিবীতে যুদ্ধ তখন প্রবল হয়ে উঠেছে।

তার পর দিনে দিনে অদৃশ্য শত্রুর নিঃশব্দ আক্রমণে হরিশঙ্করবাবু ক্ষত বিক্ষত হ'তে লাগলেন। খুকু আর মহালক্ষ্মী সে আক্রমণ সহ্য করতে পারলো না!

সে এক সুদীর্ঘ মর্মান্তিক ইতিহাস। আজও সেকথা মনে হলে হরিশঙ্কর বাবুর মাথাটা দপ দপ করে ওঠে—তাঁর সমস্ত গোলমাল হয়ে যায়! আর প্রতিশোধের তীব্র আকাঙ্খা তাঁকে যেন নিরন্তর দংশন করে। সেই অদৃশ্য মারাত্মক শত্রুকে সম্মুখ যুদ্ধে মনে মনে বার বার তিনি আহ্বান করেন। কিন্তু সে সব কথা থাক্।

বৃষ্টিতে ভিজে রাত্রির অন্ধকারে চোরের মতো নিঃশব্দে হরিশঙ্করবাবু সেদিন বাড়ি ফিরেছিলেন। তাঁর কি জানি কেন, নিজেকে মনে হচ্ছিলো অপরাধী। পরিচিত, অল্প পরিচিত আর বন্ধু বান্ধব কারোর কাছে যেতে তিনি বাকি রাখেন নি। কিন্তু সমস্তই বৃথা হয়েছিল একটি টাকাও তিনি জোগাড় করতে পারেন নি। তার সমস্ত শরীর কাঁপছিলো, মাথার অসহ্য যন্ত্রনায় তিনি টলছিলেন।

খুকুমণি কেমন আছে?

ক্ষীণ কণ্ঠে মহালক্ষ্মী উত্তর দিয়েছিলো ভালো নেই, ওগো তুমি টাকা এনেছো?

না, হরিশঙ্করবাবুর গলা থেকে শুধু একটি শব্দ বেরিয়ে এসেছিলো।

বাড়িতে দুজন রুগী। খুকু আর মহালক্ষ্মী। দু' একদিন ডাক্তার এসেছিলো তারপর আর এলো না। শেষদিন ডাক্তার জানিয়ে গেছে, কঠিন রোগ, টাইফায়েড। ডাক্তার আনবার সামর্থ্য হরিশঙ্করবাবুর নেই! চিকিৎসা করাও সম্ভব হলো না।

সেই সুদীর্ঘ মর্মান্তিক ইতিহাসের অবতারণা করা এখানে অবান্তর। একদিন শেষ রাত্রে হরিশঙ্করবাবু দেখলেন এই পৃথিবীতে আপনার বলতে তাঁর আর কেউ নেই। প্রথমে মৃত্যু ছিনিয়ে নিলো খুকুকে তারপর গেল মহালক্ষ্মী। হরিশঙ্করবাবু শুধু দাঁড়িয়ে দেখলেন—তাঁর চোখের সামনে তিনি যেন জীবন্ত মৃত্যুকে দেখলেন সে এলো আর বিনা বাধায় ছিনিয়ে নিয়ে গেল তাঁর স্ত্রী আর মেয়েকে। হরিশঙ্করবাবু কিছুই করতে পারলেন না।

কে জানতো টাকা উপার্জন করা এতো সোজা। কে ভেবেছিলো পৃথিবীতে মনুষ্যত্বের কোন মূল্য নেই। আজ হরিশঙ্করবাবু মনে মনে ভাবেন সেদিন তো যুদ্ধ ছিলো তবে কেন তিনি এ পথ বেছে নিলেন না? কেন তবে জীবন-যুদ্ধে তাঁর স্ত্রীর আর মেয়ের হলো চূড়ান্ত পরাজয়—সে-পরাজয়ের প্রতিশোধ তাঁকে নিতেই হবে।

সেই হরিশঙ্করবাবুকে দেখলে এখন আর চেনা যাবেনা। অতি সহজে ঐশ্বর্যকে তিনি আয়ত্তে এনে ফেলেছেন। তবু নতুন বাড়িতে এসে তিনি এক মুহূর্তের জন্যে শান্তি পান না—ক্ষণে ক্ষণে গুমরে গুমরে জ্বলেন।

মাঝে মাঝে চাকর এসে বলে, বাবু কী হবে এত চাল বাড়ীতে রেখে? কতো লোক না খেতে পেয়ে রাস্তায় মরে পড়ে আছে—

চুপ কর উল্লুক, নিজের কাজ কর গে আমি কী করি না করি তা নিয়ে তোকে মাথা ঘামাতে হবে না—বুঝেছিস।

কিন্তু নিভৃত রাত্রে মাঝে মাঝে চাকর দেখে বাড়ি থেকে চালের বস্তা-গুলো একে একে উধাও হ'য়ে যায়—আবার নতুন বস্তা আসে। হরিশঙ্কর-বাবু একটা দশ টাকার নোট তার হাতে গুঁজে দিয়ে বলেন, নে বেটা নে, কাউকে কিছু বলিস না—বুঝেছিস?

যে আজ্ঞে—চাকর কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে তারপর আস্তে আস্তে নোটটা পকেটে পুরে নেয়।

হরিশঙ্করবাবু অতি সন্তর্পণে ঘরগুলো দেখেন—আর কিছু দেখা যায় না। শুধু চালের বস্তা—একটার পর একটা একেবারে কড়িকাঠে গিয়ে ঠেকেছে। হরিশঙ্করবাবুর মুখে পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠে। তালা বন্ধ করে তিনি টেনে দেখেন চাবিটা ঠিক লাগলো কিনা।

যদি বলি আর্তনাদ তাহ'লে হয়তো ঠিক বলা হবে না—ক্ষুধার্তের তীক্ষ্ণ চীৎকারে কলকাতার প্রতি পথ বিচলিত হয়ে উঠলো। চারপাশে অসংখ্য ক্ষীণ শুষ্ক মানুষের ভিড় কালো ঢেউএর মতো আচ্ছন্ন করে তুললো সমস্ত শহর। ডাস্টবিন থেকে কুকুরের সংগে মারামারি করে মানুষ খাবারের ভাগ

বসালো। চাল নেই—টাকা দিয়েও লোকে চাল পায় না। ভিখিরীকে অন্ন দেবে কে? দেবার যে কিছুই নেই। ফ্যান খেয়ে রাস্তায় রাস্তায় পড়ে রইলো অনেক অর্ধমৃত মানুষ।

হরিশঙ্করবাবু তবু নির্বিকার। না খেতে পেয়ে তার চোখের সামনে যদি ধুঁকে ধুঁকে লোক মারা যায় তাহলেও তিনি চাল ছাঁড়বেন না। কেনই বা ছাড়বেন? কে বাঁচলো আর কে মরলো সে—খবরে তাঁর কি প্রয়োজন? তিনি চান লাভ—তিনি চান প্রচুর অর্থ। নিরন্নের আহার জোগালে তাঁর সে—অর্থ জমবে কেমন করে। হরিশঙ্করবাবু আরো চালের বস্তা আটকে ফেলতে লাগলেন। দিনে দিনে আর্তকণ্ঠস্বর আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগলো।

হরিশঙ্করবাবু জানেন এই দুর্ভিক্ষ কারা ডেকে আনলো। তিনি আর তাঁর মতো আরো অনেকে যারা অতিরিক্ত লাভের আশায় নিরন্নের এই রাত্রি দিন বিদীর্ণ করা হাহাকারে কান না দিয়ে নিজেদের মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়েছে। হাহাকার তাঁর কানে পৌঁছলেও মর্মে ঘা দেয় না। সহজ লভ্য অর্থের চেয়ে দেশবাসীর ক্ষুধার জ্বালা হরিশঙ্করবাবুর কাছে বড়ো নয়।

একদিন সকালবেলা কয়েকটি যুবক এসে হরিশঙ্করবাবুর সামনে দাঁড়িয়ে বললো একটা দরকারে এসেছিলাম। আপনার বাড়ির সামনে যে পার্ক আছে সেই পার্কে আমরা ডেষ্টিটিউটদের রোজ একবার করে খাওয়াবো ঠিক করেছি—

কিন্তু, বাধা দিয়ে হরিশঙ্করবাবু বললেন, সে সম্বন্ধে আমার সংগে কী প্রয়োজন?

আপনার কাছে আমরা কিছু সাহায্য চাই—

মাপ করবেন, সাহায্য করার মতো অবস্থা আমার নয়।

দেখুন সামান্য যা হয় টাকা কিংবা চাল—

এ সময়ে চালের সাহায্য আপনারা আশা করেন কি করে? আমার পক্ষে কোন রকম সাহায্য করা সম্ভব নয়—কঠিন স্বরে হরিশঙ্করবাবু তাদের নিরাশ করলেন।

তাঁকে একদিন দ্বারে দ্বারে ব্যর্থ হয়ে যেমন ক'রে ফিরতে হয়েছিল আজ তাঁর কাছ থেকে যদি সমস্ত দেশ ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায় তা হলে হরিশঙ্করবাবুর পক্ষে আত্মপ্রসাদ লাভ করাই তো স্বাভাবিক। বিদ্বেষের চাপা হাসি তাঁর মুখে ফুটে উঠলো।

মাঝে মাঝে হরিশঙ্করবাবু যখন বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকেন রাস্তা দিয়ে তখন ঝাণ্ডা উড়িয়ে বিরাট শোভাযাত্রা যায়—অতি লোভীদের ধ্বংস কর, ব্ল্যাকমার্কেটিং আনলো কারা—আনলো কে? ধ্বংস কর—লোভীর দল নিপাত যাক—তাড়াতাড়ি হরিশঙ্করবাবু বারান্দা থেকে স'রে আসেন।

আজকাল সকাল থেকে রাত্তির অবধি অর্থাৎ যতোক্ষণ হরিশঙ্করবাবু বাড়িতে থাকেন ততোক্ষণ প্রায়ই তাঁকে বিরক্ত হতে হয়। মা ফ্যান দাও—সেই এক ঘেয়ে ক্লান্তিকর কাতর কণ্ঠস্বর তাঁর কানে যেন দংশন করে। কুকুরের মত বাড়ির সীমানা থেকে তাদের তাড়িয়ে দিতে হরিশঙ্করবাবু বিলম্ব করেন না। কিসের অপূর্ব স্বাদ পেয়ে তাঁর অন্তরের সমস্ত কোমলতা আজ যেন একেবারে শুকিয়ে গেছে।

চার পাশে আর্ত কণ্ঠস্বর ভাসে।

বহুদিন পর আবার সেই স্বপ্ন!

হরিশঙ্করবাবুর ঘুম ভেঙে গেল—তার চোখে জল চিক চিক করছে। খুকু বেঁচে থাকলে এতোদিনে কতো বড়ো হতো। তিনি একবার মনে মনে কল্পনা করে নিলেন।

গ্রীষ্মের মায়াময় মন্থর রাত্রে অতীতের সেইসব দুঃখ-মেশানো স্মৃতি হরিশঙ্করবাবুর মনে ভিড় করে এলো। নিরন্নের যে হাহাকার আজ সমস্ত শহর আচ্ছন্ন করেছে, আজ থেকে কয়েক বছর আগে সে-হাহাকার উঠেছিলো হরিশঙ্করবাবুর ঘর থেকে ঘরে, গ্রাম থেকে শহরে। কিন্তু তিনি আজ নিশ্চিন্ত—দেশব্যাপী এই জ্বালা আজ তাঁর গায়ে সামান্য আঁচও লাগাতে পারেনি।

হঠাৎ খাবার ঘরে একটা শব্দ হলো। একটা প্লেট এইমাত্র প'ড়ে ভেঙে গেল। চমকে উঠে ব'সলেন হরিশঙ্করবাবু। এখনও মনে হচ্ছে কে যেন বাসন নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। তাঁর চাকর তো আজ ছুটি নিয়ে থিয়েটার দেখতে গেছে। তাড়াতাড়ি হরিশঙ্করবাবু খাবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কিন্তু সে-ঘরে গিয়ে কী দেখলেন হরিশঙ্করবাবু? বিস্ময়ে স্তম্ভিত হ'য়ে

তিনি কিছুক্ষণ নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। ক্ষুধার এমন বীভৎস রূপ তিনি আর কখনও দেখেন নি। হরিশঙ্করবাবু দেখলেন, বছর এগারো-বারো বয়সের শীর্ণ একটি মেয়ে তাঁর খাবারের অবশিষ্ট নিদারুণ ক্ষুধার জ্বালায় প্রায় গ্রাস করে চলেছে। তার চোখে মুখে ফুটে উঠেছে গ্রাস করার তীক্ষ্ণ আকাঙ্খা। ক্ষুধা যেন মূর্তি গ্রহণ করে হরিশঙ্করবাবুর সামনে এসে পড়েছে। তিনি শিউরে উঠলেন।

খুকু বেঁচে থাকলে কী এত বড়ো হ'তো!

হঠাৎ হরিশঙ্করবাবুকে দেখতে পেয়ে মেয়েটি তীব্র আর্তনাদ ক'রে উঠলো। তিনি বুঝতে পারলেন যে মেয়েটি তাঁকে দেখে ভয় পেয়েছে। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে তিনি স'রে গেলেন।

পরদিন হরিশঙ্করবাবুর চালের বস্তা অনেক কমে এলো। আর তাঁকে দেখা গেল তাঁর বাড়ির সামনে সেই পার্কে—যেখানে অসংখ্য মানুষকে খাওয়ানো হয়।

প্রচুর উৎসাহে হরিশঙ্করবাবু নিজেই পরিবেশন করছেন।

মঙ্গলবার রাত্রি ঃ ১লা আশ্বিন ঃ ১৩৫২ কলিকাতা

মেকি

কতগুলো দুর্লভ মূল্যবান মোহর !

সংসারের চাকা যখন দৈনন্দিন অভাবে মন্থর হয়ে ওঠে রামকৃষ্ণবাবু তখন আলমারী খোলেন—মেহগনি কাঠের অতি বিরাট প্রাচীন আলমারী ! তারপর আস্তে আস্তে সুন্দর একটি কাচের কৌটো হাতে তুলে নেন আর বৈদ্যুতিক আলোয় যেন কথা বলে ওঠে মোহরগুলো—ছোটো বড় মাঝারি চৌকো আরও অনেক। আনন্দে গর্বে রামকৃষ্ণবাবু মেতে ওঠেন। এ মোহরগুলো তাঁর বর্তমান জীবনের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ !

কিন্তু এগুলোর বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ আছে। নিরুপমা মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণবাবুর কাছে অসহ্য হয়ে ওঠে।

আমার কথা না হয় ছেড়েই দাও, কিন্তু মেয়েটা ? তারও কি সাধ আহ্লাদ নেই, এ বয়সে গয়না-কাপড় না পরলে আর কবে পরবে ?

হবে, ধীর গম্ভীর স্বরে রামকৃষ্ণবাবু বললেন, অবস্থা ভালো হলেই সব হবে !

সে আশায় তো বিয়ের পর থেকেই বসে আছি। কিন্তু না, নিজের কথা বলতে আসিনি তোমার কাছে, ভয় নেই। মেয়েটাকেও কি অবস্থা ভালো হবার আশায় বসিয়ে রাখবে ? সে সময়ের জন্যে তো আমিই আছি।

একটু বিরক্ত হয়ে রামকৃষ্ণবাবু বললেন, আমি কী করতে পারি বলো ?

ইচ্ছে করলেই তুমি গৌরীর গয়না গড়িয়ে দিতে পারো।

না, আমি এখন তা পারি না, পারলে তোমার বলার অপেক্ষায় থাকতাম না।

হঠাৎ নিরুপমা বলে উঠলো, ওই মোহরগুলো রেখেছো কি করতে ? পঞ্চুমামা সেদিন বলছিলো সোনার চেয়ে একপয়সা বেশি দাম ওগুলোর হবে না। বড়োবাজারে নাকি অমন মোহর অজস্র পাওয়া যায়—

তাই নাকি ? একটু হেসে রামকৃষ্ণবাবু বললেন, তোমার পঞ্চুমামাকে বলে দিও আমার কাছে যে-জিনিস আছে সে-জিনিস সমস্ত পৃথিবীর

মধ্যে খুব কম লোকের কাছেই পাওয়া যায়। আর সোনার দামে এর দাম নয়—এর মূল্য বোঝা তোমার পঞ্চুমামার সাধ্য নয়।

হয়তো কারুরই সাধ্য নয়। কিন্তু যে-জিনিসের মূল্য কেউই বুঝতে পারে না সেগুলো রেখেই বা লাভ কি? তার চেয়ে এমন ক'রে নিলেই তো হয় যেন সকলে মূল্য বুঝতে পারে? মানে আমি গৌরীর গয়নার কথা বলছিলাম—

রামকৃষ্ণবাবুর আর ধৈর্য রইলো না। আলমারী বন্ধ করে চাবি পকেটে নিয়ে তিনি বেরিয়ে গেলেন।

সেই পুরানো একঘেয়ে ইতিহাস!

তবু নিঃশব্দে রামকৃষ্ণবাবু সমস্ত কিছু মেনে নিয়েছেন। তিনি জানেন চিরদিন তাঁর স্বাতন্ত্র্য খোদাই করা থাকবে মোহরগুলোর গায়ে। সেগুলোই তাঁর বংশের উজ্জ্বল ইতিহাসের জলন্ত প্রমাণ। মোহরগুলো রামকৃষ্ণবাবুর কানে গেয়ে ওঠে সেই ইতিহাস! তাই সেগুলোকে তিনি আঁকড়ে ধরতে চান।

মাঝে মাঝে মোহরগুলো হাতে নিয়ে প্রায় অবশ হয়ে যান। তীব্র অনুভূতিতে তাঁর শরীর কেঁপে ওঠে!

পর্দা সরে যায়—

বিরাট বাড়ি, প্রচুর অর্থ আর নিশ্চিন্ত আরাম। রায়চৌধুরী পরিবারের কথা কে না জানতো তখন। সেই পরিবারে রামকৃষ্ণবাবু বেড়ে উঠেছেন।

পিতামহের অনেক গভীর কথা আজও তাঁর কানে ভিড় করে, নিজে না খেতে পেয়ে মরলেও আভিজাত্যকে কখনও মারবি না। এ সহজে পাওয়া যায় না আর এর চেয়ে বড়ো জিনিস আর নেই।

রামকৃষ্ণবাবুর বাবা একথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। উত্তরাধিকার সূত্রে ছেলেকে তিনি দিয়ে গেলেন শুধু বংশ গৌরব। একে একে সমস্ত দেনা মিটিয়ে রামকৃষ্ণবাবু দেখলেন তাঁর কাছে অবশিষ্ট আছে শুধু মোহর—তাঁর বনেদী ঘরের চিহ্ন।

বাবার মৃত্যুর পর কি ভাবে এ মোহরগুলোকে তিনি রক্ষা করে এসেছেন

সেকথা ভেবে তাঁর নিজেকে এ বংশের সম্পূর্ণ উপযুক্ত সন্তান বলে মনে হয় বৈকি !

খুব অল্প বয়সেই যথারীতি তাঁর বিয়ে হয়েছিল। এ বংশে চাকরি করার কল্পনা কেউ কখনো করেনি। কিন্তু নিরুপমার সাংসারিক অভিযোগে রামকৃষ্ণ-বাবু চাকরি গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। প্রথম প্রথম এজন্যে তাঁর লজ্জার সীমা ছিল না। এখনও মাথা নিচু ক'রে তিনি অফিসে ঢোকেন আর ঠিক তেমনি করেই যথা সময়ে বেরিয়ে আসেন। কথাবার্তা কারুর সঙ্গে বলেন না। চাকরি তাঁর মতো লোকের জন্যে নয়।

তবু দেখতে দেখতে সেই চাকরির ওপর রামকৃষ্ণবাবুকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হ'লো। অবস্থার এই পরিবর্তন তার বুকে মুহূর্তে মুহূর্তে বাজে।

তিনি জানেন এ বাড়িতে তাঁকে একেবারেই মানায় না। বর্তমান অবস্থার সংগে তাঁর চরিত্রের তফাৎ অনেক। তবু রামকৃষ্ণবাবুর দৃঢ় বিশ্বাস যে তিনি যেখানে যেভাবেই থাকুন না কেন, মোহরগুলো তাঁর সত্যিকার পরিচয় পতাকা তুলে ধরবে। পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাকে যেখানেই নামিয়ে আনুক, মনে মনে রামকৃষ্ণবাবু সেই উত্তুঙ্গ শিখরে বসে আছেন—সেখান থেকে কার সাধ্য তাঁকে নামিয়ে আনে।

কারোর কাছে কোন অভিযোগ তিনি করেন না। শুধু সুযোগ পেলেই কথায় কথায় সাধারণকে প্রচ্ছন্ন গর্বের সংগে তাঁর মহামূল্য মোহরের কথা জানিয়ে দেন !

রামকৃষ্ণবাবুর মেয়ে গৌরী !

ছেলেবেলায় তিনি তাকে শোনাতেন, শোন গৌরী, এ মোহরগুলো দেখ—আকবরী মোহর। খুব বড়লোকের বাড়ি ছাড়া এগুলো কোথাও থাকে না।

গৌরী সেগুলো নেড়ে চেড়ে দেখে বলতো, এগুলো কিসের বাবা—সোনার ?

হ্যাঁ, চাপা হাসি হেসে রামকৃষ্ণবাবু বলতেন, খাঁটি সোনার, তোর দাদু আমাকে দিয়ে গেছেন।

বাঃ, কী সুন্দর !

তারপর গৌরী অবাক হয়ে শুনতো রূপকথার মতো সে ইতিহাস। আর মুগ্ধ বিস্ময়ে মোহরগুলোর দিকে চেয়ে থাকতো।

মাঝে মাঝে রামকৃষ্ণবাবুকেও সাংসারিক প্রয়োজন ঘিরে ফেলে। তাই নিরুপমার সংগে তাঁর কলহ হয়।

একদিন সকালবেলা নিরুপমা বললো, শুনছো, আজ সকাল থেকে চাকর পালিয়েছে, কাজেই তোমাকেই তো বাজার যেতে হবে।

কী বললে? রামকৃষ্ণবাবুর স্বরে বিস্ময় ঝরে পড়লো।

চাকর নেই, তুমিই বাজারে যাও।

কাকে কী বলছো তুমি!

তবে আমিই যাই বাজারে? না খেয়ে তো থাকতে পারি না—

থেমে থেমে রামকৃষ্ণবাবু বলে উঠলেন, যে কদিন চাকর না পাওয়া যায়, প্রয়োজন হলে সে ক'দিন না খেয়ে থাকতে হবে।

বাঃ, চমৎকার বিধান, একটু পরে হঠাৎ সুর বদলে নিরুপমা বললো, অতো মাইনে দিয়ে চাকর রাখারই বা দরকার কি বাপু? তার চেয়ে—

অনেক দরকার। চাকর ছাড়া কোন ভদ্রলোকের চলে না।

কিন্তু আজ যে ভদ্রতাকে বাঁচাতে চাও, এমনভাবে চললে সংসারে একটা বিরাট ছিদ্র করে দশজনের সামনে সে একদিন ফেটে বেরিয়ে পড়বে, সেকথা বুঝতে পারো না?

এতে বোঝবার কিছু নেই!

অবুঝ স্বামীর ওপর নিরুপমার মায়া হয়। তার স্বামী এতো অবুঝ, স্পষ্ট করে বোঝালেও কিছু বোঝে না। যে জিনিস ধরে রাখা যাবে না, যা কিছুতেই ধরে রাখার সামর্থ্য তার নেই সেটাকেই আঁকড়ে রাখার প্রাণপণ ব্যর্থ চেষ্টা তাকে পঙ্গু করে রেখেছে। নিরুপমা স্পষ্ট বুঝতে পারে তার স্বামী সহজভাবে কিছুই করতে পারে না। বোধ হয় নিশ্বাস নিতেও তার কষ্ট হয়।

আস্তে আস্তে নিরুপমা বললো, শোন, ওগো তুমি সহজ হ'তে চেষ্টা করো—

আমি খুবই সহজ আছি।

না, তুমি মোটেই সহজ নেই। তাই যদি হবে তাহ'লে পদে পদে তোমার এত সঙ্কোচ কেন? কেন তুমি সাধারণের মতো চলাফেরা করতে পারো না? তোমার সব কিছুতেই কেমন যেন একটা আড়ষ্ট ভাব?

সাধারণের মতো চলাফেরা আমাকে করতে বলো কেন, আমি কি সাধারণ?

তবে তুমি কী? কী তোমার অসাধারণত্ব?

আমি কোন্ বংশের ছেলে সেকথা জানো ?

হেসে নিরুপমা বললো, কী মূল্য তার ?

কেমন করে তুমি বলো যে মূল্য নেই ?

গৌরী এসে বললো, বাবা, আজ তাহ'লে আমি একাই কলেজে যাই ?

যতোদিন চাকর না পাওয়া যায়, ততোদিন তোমাকে কলেজে যেতে হবে না।

না গেলে চলবে না বাবা, সামনেই টেস্ট্ পরীক্ষা।

আমি তোমায় পৌঁছে দিতে পারি না।

কি দরকার তার ? এই তো কাছেই আমি একাই যাই না ?

না, গম্ভীরস্বরে রামকৃষ্ণবাবু বললেন, নিজেকে সুলভ করো না।

গৌরী চুপ করে রইলো। কিন্তু রামকৃষ্ণবাবু অফিসে বেরিয়ে যাবার পর যথাসময়ে সে পালিয়ে কলেজে গেল।

আর রামকৃষ্ণবাবু গৌরীকে মোহর দেখান না।

সে একদিন বলেছিল, এগুলো রেখে কী হবে বাবা ? তার চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে দিয়ে দিলে অনেকের উপকারে আসে।

রামকৃষ্ণবাবু গুম্ হয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি বুঝতে পারেন যে জিনিসকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরতে চান সে জিনিসের মূল্য এদের কাছে কিছু নয় কারণ সে-আবহাওয়ায় এরা বেড়ে ওঠেনি।

তাঁর অদৃষ্টকে দোষ দেন তিনি। আজকাল মাঝে মাঝে অসহ্য জ্বালায় রামকৃষ্ণবাবু গুমরে গুমরে জ্বলেন। তাঁর যা আয় তাতে তিনি যেভাবে থাকতে চান সেভাবে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। চারপাশ থেকে একটা বিরাট শৈথিল্য তাঁকে ঘিরে ধরে। তবু তিনি বিচলিত হন না। তাঁর উজ্জ্বল অতীতের সাক্ষী মোহর। সেগুলো হাতে নিয়ে তিনি তাকিয়ে দেখেন। আর তাঁর সমস্ত শৈথিল্য যেন কেটে যায়।

কিন্তু অকস্মাৎ একদিন রামকৃষ্ণবাবুর আসন টলে উঠলো।

এতোদিন তিনি আঘাত পেয়েছেন—বুঝতে পেরেছেন স্ত্রী মেয়ে তাঁকে সমর্থন করে না, প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঝড়ের মতো তাঁকে নাড়া দিয়ে গেছে বারবার কিন্তু কোন ক্ষতি তাঁর হয়নি। মাঝে মাঝে বিচলিত হলেও আসন টলে ওঠেনি।

নিরুপমাই কথা পাড়লো, শোন, অধৈর্য হ'য়ো না, আর আমার মনে হয় বাধা দিতে গেলে কোন ফল হবে না—

কি বলছো, স্পষ্ট করে বলো?

নিরুপমা স্পষ্ট করেই বললো, গৌরী একটি ছেলেকে বিয়ে করতে চায়।

হঠাৎ ঘরে যেন একটা ভীষণ শব্দ হ'লো। রামকৃষ্ণবাবুর মনে হ'লো কী যেন ভেঙে পড়ছে। নিজের কানকে তিনি যেন ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারলেন না।

কী—কী বললে? তাঁর স্বর কাঁপছে।

গৌরী একটি ছেলেকে পছন্দ করেছে, তাকেই ও বিয়ে করবে। ছেলেটি ভালোই, শ' দেড়েক টাকা মাইনের চাকরি করে। বাপের অবস্থা খুব ভালো না হলেও ছেলে তো নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে—

গৌরী কোন্ বংশের মেয়ে সে-খবর রাখো? রামকৃষ্ণবাবু প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, এসব কথা আমার কাছে তোমরা উচ্চারণ করো কোন্ সাহসে?

নিরুপমা অপমান বোধ করলো, সাহস যখন বেড়েই গেছে দেখছো তখন তো আর সেকথা বলে লাভ নেই। তবে হ্যাঁ, একথা বলতে পারি যে গৌরী বিয়ে করবেই, একটু থেমে নিরুপমা আবার বললো, আর বংশের কথা বলছো, তার স্বাধীন মন কি বংশের চেয়ে বড়ো নয়?

না, বংশ-মর্যাদার দিকে চেয়ে নিজেদের অনেক কিছুই উৎসর্গ করতে হয়।

তুমি তা পারো, কিন্তু নিজের স্বাধীনতাকে পিষে মারতে ওরা পারে না।

ও, তাহলে তোমারও সায় আছে দেখছি, বেশ ওকালতি করতে শিখেছো তো—

হ্যাঁ, কারণ না ক'রে উপায় নেই। ওরা বিয়ে করবেই যখন তখন বাধা দিয়ে ফল নেই, নিজেদেরই হাস্যাস্পদ হতে হবে।

বাজে কথা বলো না। আমার মেয়ে একটা গরিবের ছেলেকে বিয়ে করবার আগে যেন বিষ খেয়ে মরে—আমি বিষ এনে দেবো।

তুমি বিষ এনে দিতে পারো কিন্তু কোন দুঃখে সে মরতে যাবে ?

দেখা যাক্ !

বেশ গৌরীকে পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি তার সংগে বোঝাপড়া কর—

বোঝাপড়া ! এসব বাজে কথা নিয়ে মাথা ঘামাতেও আমার মাথা কাটা যায়, তাকে বলে দিও সে যেন আমার সামনে না আসে !

গৌরী অবশ্য সামনে এসেছিলো কিন্তু সেকথা পরে।

রামকৃষ্ণবাবু রাগের ঝোঁকে যা-ই বলুন না কেন, মনে মনে কোথায় যেন তিনি তৃপ্তি পেলেন—সন্তুষ্ট হলেন। কে যেন তাঁর একটা রাত্রিদিন খচ্‌খচ্‌ করা কাঁটা তুলে নিলো।

গৌরীর বিয়ের কথা রামকৃষ্ণবাবু অনেক দিন থেকেই ভাবছিলেন আর সংগে সংগে তাঁর ভাবনাও বেড়ে যাচ্ছিলো। তিনি জানতেন বর্তমানে বিয়ের ব্যাপারে খরচ অনেক—সে-ব্যয়ভার বহন করার সাধ্য তাঁর নেই। অথচ সাধারণের মতো সামান্য আয়োজন করে বিয়ে দিতেও তাঁর সম্ভ্রমে বাধে। সমস্ত দিক ভেবে এ বিষয়ে তিনি নীরব ছিলেন—তাঁর কিছু করবার উপায় ছিলো না। এ ভাবনা কাঁটার মতো তাঁর বুকে খচ্‌খচ্‌ করতো।

কিছুদিন আগে একবার নিরুপমা বলেছিলো, পঞ্চুমামা একটা খুব ভাল ছেলের খবর এনেছে, নগদ কিছুই চায় না তারা, শুধু গয়না দিতে হবে।

বুঝতে পারছি নিরু কিন্তু এখন—

কেন ? গয়না দেয়া তো আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়।

কেমন করে সম্ভব ?

মোহরগুলো ভেঙে ফেললেই তো হয় !

রামকৃষ্ণবাবু জ্বলে উঠেছিলেন, ওগুলো যে আমার কাছে আছে সেকথা ভুলে যাও নিরুপমা, মোহরগুলো গেলে আমার পরিচয় দেবার আর কী থাকবে বলতে পারো ?

তবে যা ইচ্ছে করো !

তারপর গৌরীর আর কোন সম্বন্ধ আসেনি।

সেই গৌরীর বিয়েতে রামকৃষ্ণবাবুর কোন দায় থাকবে না ভেবে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। আর অর্থের দিক থেকেও এক্ষেত্রে তাকে লজ্জিত হতে হবে না। যা ইচ্ছে করুক তারা !

তবু তাঁর মনে আবার আগুন জ্বলে উঠলো। নিজের ইচ্ছেয় একটা গরিবের ছেলেকে গৌরী বিয়ে করছে—কী সাহস! তাঁর শরীরের সমস্ত শিরা যেন ফুলে উঠলো। না না, কিছুতেই প্রশ্রয় দেয়া যায় না।

কান্না মেশানো কোলাহল শুনে রামকৃষ্ণবাবু বাইরের ঘরে এলেন। সে-ঘরে গৌরী, সুন্দর একটি ছেলে আর নিরুপমা। গৌরীর মাথায় সিঁদূর দেখে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতে তাঁর বিশেষ দেরি হলো না। তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

খুব আস্তে আস্তে নিরুপমা বললো, তোমার মেয়ে জামাই, এদের আশীর্বাদ করো!

ওরা প্রণাম করলো।

কয়েক মুহূর্ত রামকৃষ্ণবাবু চুপ করে রইলেন। তারপর নিস্তেজ গলায় থেমে থেমে বললেন, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা দাঁড়াও, দাঁ-ড়াও—তিনি প্রায় টলতে টলতে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

একটু পরেই আবার ফিরে এসে বললেন, গৌরী তুমি যা করেছো সেটা আমার কাছে খুবই সাংঘাতিক—এতো সাংঘাতিক যে তোমাকে তার কিছুই আমি বোঝাতে পারবো না। তবু আমার বংশের ধারা তোমার রক্তে বইছে—তা' আমি অস্বীকার করতে পারি না। তাই তোমাকে আমি এটা দিলাম—আমার আশীর্বাদের চিহ্ন, এই নাও—একটা আকবরী মোহর তিনি গৌরীর হাতে দিয়ে বললেন, কিন্তু তোমরা আর এ বাড়িতে এসো না—আমি মনে করবো আমার মেয়ে মরে গেছে।

কী বলছো যা-তা? নিরুপমা গৌরীর হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললো, ভারী জিনিস দিলেন উনি, লজ্জাও করে না! যাক তুই কিন্তু কিছু ভাবিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে দুদিন পরে। হ্যাঁ, তোকে তো কিছুই দিতে পারলাম না, আর এ বিয়ের জন্যে কোন পক্ষ থেকেই তো কিছু পেলি না। তোর কানের—হ্যাঁ, তুই এক কাজ কর, মোহরটা দিয়ে যা আমার কাছে, ওটা ভাঙিয়ে তোকে একটা কানের গয়না—

না মা, ব্যস্ত হয়ে গৌরী বললো, বাবার অত সখের জিনিস—

আরে, তুইও কি পাগল হলি তোর বাবার মতো? ওটা বাক্সে তুলে রেখে কী করবি? তার চেয়ে কানের গয়না গড়ানো সব দিক থেকে ভালো। দে

আমার কাছে ওটা দিয়ে যা, আমি স্যাকরাকে দিয়ে দেবো—গৌরীর হাত থেকে এক রকম জোর করেই নিরুপমা মোহরটা নিয়ে নিলো।

রামকৃষ্ণবাবু বাইরের ঘরে বসেছিলেন—তাঁর মুখ গম্ভীর বিষণ্ণতায় ভরে গেছে। মাসের প্রথম দিকে এমনি দুর্ভাবনা তাঁকে বড়ো পীড়া দেয়। বাড়ি ভাড়া আর সংসার খরচের চিন্তা এ সময় প্রবলভাবে নাড়া দেয়। এই ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির স্পর্শ এড়াবার জন্যে রামকৃষ্ণবাবু উন্মাদের মতো হয়ে ওঠেন।

আজ প্রথম তাঁর মনে ঝলসে উঠলো মোহরগুলোর কথা। সম্পদ যখন তাঁর রয়েছে তখন অর্থের স্বল্পতা বারবার সহ্য করা কেন! কিন্তু সংগে সংগে তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন—তাঁর মনে হ'লো এইমাত্র যেন কোন অশুচি নোংরা জিনিস স্পর্শ করেছেন। রামকৃষ্ণবাবুর নিজের ওপর ঘৃণা হ'লো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবেশ করলো নিরুপমা, শোন, গৌরীর কানের গয়না গড়াবার জন্যে স্যাকরাকে তোমার মোহরটা দিয়েছিলাম—ওগুলো সোনা নয়, রুপোর ওপর সোনার প্লেটিং করা, এই দেখ না স্যাকরা আজ ফেরৎ দিয়ে গেল—

বিস্ফারিত চোখে রামকৃষ্ণবাবু দেখলেন নিরুপমার হাতে তাঁর গৌরীকে দেয়া আকবরী মোহর দু'টুকরো করা!

অগ্রহায়ণ : ১৩৫২ : কলিকাতা

তবু তাঁর মনে আবার আগুন জ্বলে উঠলো। নিজের ইচ্ছেয় একটা গরিবের ছেলেকে গৌরী বিয়ে করছে—কী সাহস! তাঁর শরীরের সমস্ত শিরা যেন ফুলে উঠলো। না না, কিছুতেই প্রশ্রয় দেয়া যায় না।

কান্না মেশানো কোলাহল শুনে রামকৃষ্ণবাবু বাইরের ঘরে এলেন। সে-ঘরে গৌরী, সুন্দর একটি ছেলে আর নিরুপমা। গৌরীর মাঁথায় সিঁদুর দেখে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতে তাঁর বিশেষ দেরি হলো না। তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

খুব আস্তে আস্তে নিরুপমা বললো, তোমার মেয়ে জামাই, এদের আশীর্বাদ করো!

ওরা প্রণাম করলো।

কয়েক মুহূর্ত রামকৃষ্ণবাবু চুপ করে রইলেন। তারপর নিস্তেজ গলায় থেমে থেমে বললেন, ও হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা দাঁড়াও, দাঁ-ড়াও—তিনি প্রায় টলতে টলতে পাশের ঘরে চলে গেলেন।

একটু পরেই আবার ফিরে এসে বললেন, গৌরী তুমি যা করেছো সেটা আমার কাছে খুবই সাংঘাতিক—এতো সাংঘাতিক যে তোমাকে তার কিছুই আমি বোঝাতে পারবো না। তবু আমার বংশের ধারা তোমার রক্তে বইছে—তা' আমি অস্বীকার করতে পারি না। তাই তোমাকে আমি এটা দিলাম—আমার আশীর্বাদের চিহ্ন, এই নাও—একটা আকবরী মোহর তিনি গৌরীর হাতে দিয়ে বললেন, কিন্তু তোমরা আর এ বাড়িতে এসো না—আমি মনে করবো আমার মেয়ে মরে গেছে।

কী বলছো যা-তা? নিরুপমা গৌরীর হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বললো, ভারী জিনিস দিলেন উনি, লজ্জাও করে না! যাক তুই কিন্তু কিছু ভাবিস না, সব ঠিক হয়ে যাবে দুদিন পরে। হ্যাঁ, তোকে তো কিছুই দিতে পারলাম না, আর এ বিয়ের জন্যে কোন পক্ষ থেকেই তো কিছু পেলি না। তোর কানের—হ্যাঁ, তুই এক কাজ কর, মোহরটা দিয়ে যা আমার কাছে, ওটা ভাঙিয়ে তোকে একটা কানের গয়না—

না মা, ব্যস্ত হয়ে গৌরী বললো, বাবার অত সখের জিনিস—

আরে, তুইও কি পাগল হলি তোর বাবার মতো? ওটা বাক্সে তুলে রেখে কী করবি? তার চেয়ে কানের গয়না গড়ানো সব দিক থেকে ভালো। দে

আমার কাছে ওটা দিয়ে যা, আমি স্যাকরাকে দিয়ে দেবো—গৌরীর হাত থেকে এক রকম জোর করেই নিরুপমা মোহরটা নিয়ে নিলো।

রামকৃষ্ণবাবু বাইরের ঘরে বসেছিলেন—তাঁর মুখ গম্ভীর বিষণ্ণতায় ভরে গেছে। মাসের প্রথম দিকে এমনি দুর্ভাবনা তাঁকে বড়ো পীড়া দেয়। বাড়ি ভাড়া আর সংসার খরচের চিন্তা এ সময় প্রবলভাবে নাড়া দেয়। এই ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির স্পর্শ এড়াবার জন্যে রামকৃষ্ণবাবু উন্মাদের মতো হয়ে ওঠেন।

আজ প্রথম তাঁর মনে ঝলসে উঠলো মোহরগুলোর কথা। সম্পদ যখন তাঁর রয়েছে তখন অর্থের স্বল্পতা বারবার সহ্য করা কেন! কিন্তু সংগে সংগে তিনি শঙ্কিত হয়ে উঠলেন—তাঁর মনে হ'লো এইমাত্র যেন কোন অশুচি নোংরা জিনিস স্পর্শ করেছেন। রামকৃষ্ণবাবুর নিজের ওপর ঘৃণা হ'লো।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে প্রবেশ করলো নিরুপমা, শোন, গৌরীর কানের গয়না গড়াবার জন্যে স্যাকরাকে তোমার মোহরটা দিয়েছিলাম—ওগুলো সোনা নয়, রুপোর ওপর সোনার প্লেটিং করা, এই দেখ না স্যাকরা আজ ফেরৎ দিয়ে গেল—

বিস্ফারিত চোখে রামকৃষ্ণবাবু দেখলেন নিরুপমার হাতে তাঁর গৌরীকে দেয়া আকবরী মোহর দু'টুকরো করা!

অগ্রহায়ণ : ১৩৫২ : কলিকাতা

উত্তরাধিকার

এই প্রকাণ্ড অট্টালিকার দেয়ালে দেয়ালে আজ ময়লা জমেছে, মরচে ধরেছে জানলার শিকগুলোয়, সমস্ত বাড়িটাই কালের প্রহারে আজ নিস্তব্ধ নিঃঝুম হয়ে গেছে। তবু প্রতি ঘরের আনাচে কানাচে রাত্রিদিন কাদের ইশারা ভাসে !

এই বিরাট অট্টালিকার চারপাশে সুমিত্রা রহস্যের আভাস পায়। তার স্পষ্ট মনে পড়ে এই বাড়িতে বিয়ে নিয়ে তার এক আত্মীয় ভীষণ আপত্তি তুলেছিলেন। কারণটা সুমিত্রা আজও জানতে পারেনি। কিন্তু ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে সে-আপত্তি খান্ খান্ হয়ে যায়। হ্যাঁ, এরা বড়লোক—খুব বড়লোক, সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বংশে সুমিত্রার বিয়ে হয়েছে।

কিন্তু প্রদীপের ব্যবহার মাঝে মাঝে সুমিত্রার আশ্চর্য লাগে। প্রদীপের বাবা অর্থাৎ সুমিত্রার শ্বশুর এখনও বেঁচে আছেন। বিয়ের পর এ বাড়িতে এসে সুমিত্রা তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যায়, অমনি বিদ্যুৎবেগে প্রদীপ সুমিত্রার হাত ধরে টেনে সরিয়ে দিল, থাক্ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হবে না। শ্বশুরের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল, টলতে টলতে তিনি তাঁর ঘরে চলে গেলেন। শাশুড়ীর সংগেও সুমিত্রাকে প্রদীপ বেশীক্ষণ থাকতে দেয় না।

প্রথমে সুমিত্রা ভেবেছিল হয়তো নতুন বিয়ের পর প্রদীপ এক মুহূর্তও স্ত্রীকে ছেড়ে থাকতে চায় না। কিন্তু আসল কারণটা বোধ হয় তা নয়। প্রদীপ যখন বাড়ি থাকে না তখনও তার ঘর ছেড়ে বেরুতে দেয় না সে সুমিত্রাকে। একদিন সে স্পষ্টই বললো, আমি চাই না, এ বাড়ির কারুর নিশ্বাস তোমার গায়ে লাগে—

কেন ? অবাক হ'য়ে সুমিত্রা বলেছিলো, এ যে আমার শ্বশুর বাড়ি—

তা' হোক, সব কথা আমি তোমাকে পরে বুঝিয়ে বলবো।

এখানকার সবাই যেন কেমন এক রকম। শুধু প্রদীপ ছাড়া। দিনের

আলোয় মেরুদণ্ড সোজা করে মাথা উঁচু করে সে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু শুধু সে, আর কেউ নয়। এ বাড়ির সবাই থাকে চোরের মত মাথা নিচু করে। আর প্রদীপকে সবাই যেন ভয় করে, তাকে এড়িয়ে চলতে চায়। তার থালা গেলাস ধোপা চাকর সমস্তই আলাদা। এ বাড়িতে থেকেও অন্য কারুর সংগে তার বিন্দুমাত্র সম্বন্ধ নেই। এ বাড়িতে প্রদীপ শুধু যেন ব্যতিক্রম।

অল্প অল্প শীতের হাওয়া দিচ্ছিলো। শরৎ শেষের স্বপ্নিল সকাল। সুমিত্রা আস্তে আস্তে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। প্রদীপ বাড়ি ছিলো না। সুমিত্রার নিজেকে মনে হয় বন্দিনী। এ বাড়ির বউ হ'য়ে এলো সে অথচ আশ্চর্য, কাউকেই সে চেনে না। এ রহস্যের সমাধান করতেই হবে।

একতালায় নেমে এলো সুমিত্রা। এ বাড়ির সমস্ত কিছুই তার অপরিচিত, কোথায় কোন ঘর সে জানে না, এমন কি প্রদীপের আত্মীয়দের সে ভালো করে চেনে না। আজ প্রদীপ বাড়ি নেই, এই সুযোগ—সুমিত্রা মনে মনে ঠিক করলো, প্রদীপ আসবার আগেই সকলের সংগে সে আলাপ করে নেবে, সব কিছু চিনে নেবে।

এ কী বউমা! ভাঁড়ার ঘরে ব'সে শাশুড়ীর চোখ বড়ো হ'য়ে গেল, তুমি এখানে এলে কেন? যাও মা, প্রদীপ ভয়ানক রাগ করবে।

কেন মা? শাশুড়ীকে প্রণাম করে সুমিত্রা আস্তে আস্তে বললো, আপনাদের সংগেও কি আমার কথা বলতে নেই? আপনারা যে আমার বড়ো আপনার—

জানি, কিন্তু তুমি যাও, প্রদীপ এসে পড়লে গোলমাল করবে, ও মোটেই চায় না যে তুমি আমাদের সংগে থাক—

কেন মা? সুমিত্রা আশ্চর্য হ'য়ে জিজ্ঞেস করলো।

কি জানি! সে কথা বরং ওকেই তুমি জিজ্ঞেস করে নিও।

ভাঁড়ার ঘর থেকে সুমিত্রা বেরিয়ে এলো। বড় অদ্ভুত এ বাড়ি। সবাই যেন অন্ধকারের মানুষ। দিনের আলো এরা এড়িয়ে চলতে চায়। এর অর্থ খুঁজে পায় না সে। সটান্ তেতালায় উঠে এলো সুমিত্রা। বাড়িসুদ্ধ সবাই

তাকে বেরুতে দেখে আজ অবাক হ'য়ে গেছে—এ যেন তারা বিশ্বাসই করতে পারে না। একটা অমংগল আশঙ্কায় তাদের চোখ বড়ো হ'য়ে গেছে—সে কথা সুমিত্রা স্পষ্ট বুঝতে পারে। এখুনি যেন একটা ভয়ংকর কিছু ঘটবে, সে-ভয়ে ভীত সবাই।

একটি মাত্র ঘর তেতালায়। সে-ঘরে প্রবেশ করে সুমিত্রা অবাক হ'য়ে গেল। সে দেখতে পেল এক বৃদ্ধ শয্যায় ব'সে আপন মনে বিড়বিড় করে কি যেন বকে যাচ্ছে। সুমিত্রাকে দেখে বৃদ্ধ অকস্মাৎ অতিমাত্রায় উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো, তার চোখের দৃষ্টি লুব্ধ হ'য়ে এলো। চিৎকার করে উঠলো সে, অনেক টাকা খেয়েছো আমার, এসো এসো তোমায় একবার প্রাণভরে দেখি—বৃদ্ধ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রে সশব্দে পড়ে গেল। তারপর ঘর মুখরিত করে দিলো তীব্র তীক্ষ্ণ অট্টহাসিতে। ছুটে পালিয়ে এলো সুমিত্রা।

ও ঘরে কেন গেলেন বউদি? পুরনো চাকর নীলকণ্ঠ বললো।

সে কথার উত্তর না দিয়ে সুমিত্রা জিজ্ঞেস করলো, ইনি কে?

প্রদীপ দাদাবাবুর ঠাকুরদা, আপনার দাদাশ্বশুর, ওঁর মাথাটা একটু খারাপ বউদি—

ও, রহস্যের কিনারা পেলো না সুমিত্রা, তোমার কোলে ও কার ছেলে নীলকণ্ঠ?

আপনার ছোটো জাওর বউদি।

সে কী? দাও, ওকে আমার কোলে দাও, সুমিত্রা ছিনিয়ে নিলে খোকাকে, কিন্তু এর চোখ দু'টো অমন কেন?

খোকা জন্মান্ধ, ওকে আমার কাছে দিন বউদি, আপনি ওকে কোলে নিয়েছেন জানতে পারলে দাদাবাবু আমায় আস্ত রাখবেন না।

বাজে ব'কো না নীলকণ্ঠ, খোকাকে নিয়ে চললাম আমি আমার ঘরে তোমাদের সবই কেমন যেন, বিরক্ত হ'য়ে দ্রুত পদক্ষেপে সুমিত্রা নিজের ঘরে চলে এলো।

ঘরে প্রবেশ করে সুমিত্রা দেখল প্রদীপ তারই অপেক্ষা করছে। সুমিত্রার কোলে খোকাকে দেখে অব্যক্ত জ্বালায় প্রদীপের মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে টান মেরে খোকাকে নিয়ে নিলো সুমিত্রার

কোল থেকে, তাকে ঘরের বার করে দিয়ে প্রদীপ এসে দাঁড়ালো সুমিত্রার সামনে। এইবার প্রদীপের চোখে মুখে দেখা গেল হতাশার চিহ্ন।

কেন তুমি ঘর ছেড়ে ওদের কাছে গিয়েছিলে সুমিত্রা ?

যাবোই বা না কেন ?

তুমি কি বুঝতে পারো না ওদের স্পর্শ থেকে সব সময় আমি তোমাকে বাঁচিয়ে চলি ?

হ্যাঁ, কিন্তু কেন ?

এদের নিশ্বাসে জার্ম্, এ বাড়ির হাওয়ায় বিষ, সুস্থ সবল মানুষ এখানে টিকতে পারে না।

একটু বিরক্ত হয়ে সুমিত্রা বল্লো, তোমাদের এ রহস্যের অর্থ আমি বুঝতে পারি না, স্পষ্ট করে বল আমাকে, আমার শাশুড়ী, শ্বশুর, দাদা শ্বশুর এদের কাছে কেন আমি যেতে পারি না ? কেনই বা পারবো না আমার গাওরকে কোলে নিয়ে আদর করতে—এ সবের অর্থ কী ?

বলছি, প্রদীপ গলাটা একটু ঠিক করে নিলো, আজ তোমাকে আমি সমস্তই স্পষ্ট ক'রে বলবো, তুমিও মাঝে মাঝে আমার ব্যবহারে অবাক হ'য়ে যাও সে কথা বুঝতে পারি।

বল তবে।

আমার পূর্বপুরুষ করে গেছে অত্যাচার, দেহের ওপর অভদ্র অত্যাচার, যার ফলে আমাদের বংশ ছেয়ে গেল বিকলাংগ শিশুতে—এদের কী করা উচিত বলতে পারো সুমিত্রা ? আমার ঠাকুরদা অসংযম আর অত্যাচারের জন্যে আজ বদ্ধ পাগল, আমার বাবার সমস্ত শরীরে দাগ, আমার ছোটো ভাই অন্ধ, এদের সংগে কেমন করে তোমাকে আমি মিশতে দেবো বল ?

সুমিত্রা কোন উত্তর দিল না, এসব যেন তার কল্পনার বাইরে।

প্রদীপ আবার বলতে লাগলো, এ বাড়ির কারুর ওপর আমার এতোটুকুও মমতা নেই, এ বংশে আমার জন্ম হয়েছে ব'লে যন্ত্রণায় আমি জ্বলে জ্বলে মরি। আমি, কেবলমাত্র আমি জন্ম থেকে এদের ছোঁয়া বাঁচিয়েছি, আমি মুক্ত, তাই এদের সংগে কোন সম্বন্ধ রাখতে চাই না—

সুমিত্রা বললো, কিন্তু তা কেমন করে হবে ? এক বাড়িতে থেকে এদের আলাদা করে রাখলে, ইচ্ছে ক'রে ওদের যে অপমান করা হয়—

ওই অপমানই ওদের প্রাপ্য, প্রদীপের চোখ দু'টো জ্বলে উঠলো। তুমি তো মুক্ত, তবে এদের সংগে মিশলে ক্ষতি কী? আমাদের ছেলে মেয়ে তো আর—

কিছুই বলা যায় না সুমিত্রা, আমি মুক্ত সেকথা সত্যি, আমার ছেলে মেয়ে কখনই ওদের মতো হবে না। কিন্তু ধরো ওদের সংগে মেশামেশি করলে তোমার যদি রোগ ধ'রে যায় তা'হলে নির্দোষ হ'লেও আমাদের ছেলেমেয়ে হবে রোগগ্রস্ত, শিক্ষিত বাপ মা হ'য়ে আমাদের কি দেখা উচিত নয় যে আমাদের শিশু হয় সুস্থ আর সবল।

নিশ্চয়ই, সুমিত্রা বললো।

তাই বিয়ের পর থেকে তোমার সংগে আমি রহস্যময় ব্যবহার করে এসেছি। ভেবে দেখ সুমিত্রা তুমি হবে মা, সমস্ত জেনে শুনে তুমি কি পৃথিবীতে নিয়ে আসবে জরাগ্রস্ত বিকলাংগ শিশু?

না না।

তবে চলো আমরা পালাই, বাঁচাই আমাদের শিশুকে—

সুমিত্রা উত্তর দিল না। তার চোখ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে। তার চোখে ভাসছিলো সুদূর ভবিষ্যতের ছবি, যখন সে মা হয়েছে—সুস্থ সবল সন্তানের স্নেহময়ী জননী!

অতি শৈশবে প্রদীপ স্বপ্ন দেখেছিলো। পৃথিবীর সংগে তার পরিচয় হয় ঘৃণার ভেতর দিয়ে। সে কল্পনা করেছিলো নতুন মহত্তর জীবনের। তাদের অভিজাত জমিদার বংশে যে-ভাঙন ধরেছে তার জন্যে সে দুঃখ করেনি কোনদিন। এই বংশে তার জন্ম হয়েছে ব'লে সে লজ্জায় মরে যেতো। এ বংশের প্রত্যেককে ঘৃণা করতো সে। সে ভাবতো, এইসব মূঢ় রোগগ্রস্ত লোকের মাঝ থেকে তাকে সরে যেতেই হবে। আপনার মনে সে লেখাপড়া করে যেত, এ বাড়ির কারুর সংগে মিশতো না। এই বিষাক্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও সে যেন অকস্মাৎ পেয়েছে মুক্তির স্বাদ। এ একটা দুর্ঘটনা বৈকি! প্রদীপ মাথায় ক'রে নিয়ে এসেছে কার আশীর্বাদ, তা' বিফল হবে না।

একদিন সুমিত্রার সংগে প্রদীপের পরিচয় হ'লো। ইতিপূর্বে বিয়ের কথা মুহুর্তের জন্যেও তার মাথায় আসেনি। এইবার মনে হ'লো সুমিত্রা তার জীবনে এলে হয়তো মংগলই হবে। কিন্তু তার বংশে যে অভিশাপ। নিজেকে ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিলো প্রদীপ। না, তার কোন ভয় নেই। নির্ভয়ে সুমিত্রাকে ঘরে নিয়ে এলো সে।

তারপর একদিন সুমিত্রাই খবর দিলো। তীব্র অনুভূতিতে প্রদীপের সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে উঠলো। এতো আনন্দ সে রাখবে কোথায়! সুমিত্রা সন্তানবতী। পরক্ষণেই প্রদীপের মনে সাপের মত হিল্ হিল্ করে উঠলো ঘৃণা। এখানে আর এক মুহূর্ত ও নয়। তাহলে তারও সন্তানকে স্পর্শ করবে এ বংশের পাপ। না না, তা কখনই হতে পারে না—এদের কাছ থেকে প্রদীপকে পালাতেই হবে।

সেই দিনই ওরা ভাড়া করা নতুন বাড়িতে উঠে গেল।

আসন্ন হেমন্তের অস্পষ্ট ইংগিতে অপরূপ হয়ে উঠেছে দিগন্ত। চারপাশে ফুটে ওঠার কী বিপুল সম্ভাবনা! সমারোহের স্বাক্ষরে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে পৃথিবী। ফসলের দিন এলো! অনেক এলোমেলো চিন্তা নিরন্তর মনে ভিড় করে। পাখির গানে, পাতার মর্মরে, শিশির ঝরা পথে পথে কার আবির্ভাবের ছায়া পড়েছে। নতুন বাড়িতে এসে প্রদীপ আর সুমিত্রা দিশেহারা হয়ে গেল।

প্রদীপ অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'লো। এ বাড়ি মুক্ত, এখানে নিশ্চিন্তে নিঃশ্বাস নেয়া যায়, কোন আশংকা নেই। ওবাড়ি থেকে চলে আসার সময় সুমিত্রার চোখ শুকনো ছিল না। অনেক দিনের একান্নবর্তী সংসার। এমনি করে প্রদীপের চলে আসাটা সকলের স্বপ্নেরও অগোচর। কান্নাকাটির ধুম পড়ে গেল। বড়ো ছেলে প্রদীপ, সে যেন জন্মের মতো চলে যাচ্ছে।

মা বললেন, বউমা, তোমার ছেলেপুলে নেই, এমনি করে ছেলে চলে

গেলে কেমন লাগে সে-জ্বালা যেন তোমায় কখনও না পেতে হয়—ভারী কান্নায় তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হ'য়ে গেল।

বাবা এসে দাঁড়ালেন যাবার সময়, যাস না প্রদীপ তুই, আমরা তোকে যেতে দেব না, জোর করে আটকে রাখবো—

তা' হয় না বাবা, প্রদীপ বলেছিলো, আমার ওপর তোমাদের কোন জোরই নেই।

মুখে কিছু না বললেও সুমিত্রা বুঝতে পারলো সকলে তাকেই মনে মনে এর জন্যে দায়ী করেছে। সে-ই যেন প্রদীপকে আলাদা করে নিয়ে যাচ্ছে এদের কাছ থেকে। লজ্জায় সুমিত্রা মাটির সংগে মিশে যেতে চাইলো।

দেখ, নতুন বাড়িতে এসে সুমিত্রা বললো প্রদীপকে, ও বাড়ির সবাই ভেবেছে আমি তোমাকে আলাদা ক'রে আনলাম—

ভাবুক না, তোমাকে হাজারবার বলেছি ওদের নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাবেনা—

তবু—

না না, এ পৃথিবীতে ওদের বাঁচতে দেওয়াই অন্যায়—

তবু তোমার মা, তোমার বাবা—

তাতে হয়েছে কী? ওরা আমার মা বাবা ব'লে লজ্জায় আমি কোথাও মুখ দেখাতে পারি না, ও পরিবারে জন্ম একটা দুর্ঘটনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

থাক্ তোমার সংগে তর্ক করতে চাই না, সুমিত্রা হাসলো।

অত্যাচারের মধ্যে দিয়ে যাদের দিন কাটে, প্রদীপ বললো, স্বার্থে অন্ধ হয়ে যারা পরকে চাবুক মেরে অর্থ শুষে নেয়, ঠিক এমনি করেই তাদের ভাঙন ধরে, তাদের দয়া করাও পাপ!

হেমন্তের রহস্য-মদির গভীর রাত্রে মাঝে মাঝে আজকাল প্রদীপের ঘুম ভেঙে যায়। অলস শয্যায় মধুর কল্পনা কণ্টকিত করে ওর সারা দেহ। তীক্ষ্ণ অনুভূতি ওর সমস্ত চেতনাকে নাড়া দেয়। আর কিছুদিন পর কোথা থেকে একজন অতিথি আসবে তাদের মাঝে। প্রদীপ হবে পিতা। কী

আশ্চার্য এই সৃষ্টি-রহস্য! আবেশে প্রদীপের সমস্ত দেহ অবশ হ'য়ে আসে।

মিত্রা, প্রদীপ ডাকে।

কী বলছো?

ঘুমচ্ছো?

এই মাত্র ঘুমটা ভেঙে গেল।

আমারও, তাইতো ডাকলাম তোমায়।

একটু চুপ চাপ। শিশির-ঝরা হেমন্ত রাত্রির মদির মধুর সৌরভ বাতাসে ভাসে। ওদের চোখে ঘুম আসে না। সুমিত্রা নিজের কথাই ভাবে। এ কী সম্ভব? সে হবে মা! এ তো বিশ্বাস করাই যায় না। শিহরণ জাগে ওর দেহে।

খোকা কেমন দেখতে হবে বলো তো?

বাপের মতো, প্রদীপ হেসে উত্তর দেয়।

হ্যাঁ, ঠিক বলছো, আমাদের নিশ্চয়ই কালো কুৎসিত ছেলে কখনো হবে না।

নিশ্চয়ই নয়।

এমনি আলোচনার মধ্যে দিয়ে রাত শেষ হয়।

রঙ্ লেগেছে সুমিত্রার শরীরে। যৌবনের লাবণ্যে ওর সারা অংগ আজকাল যেন ঝলসে উঠেছে! গোলাপী আভায় গাল দু'টো হয়েছে অপরূপ। ওর চলায় বলায় নেমেছে আসন্ন মাতৃত্বের ছায়া। স্বপ্নাবিষ্টের মত প্রদীপ মাঝে মাঝে তার দিকে চেয়ে থাকে।

কী দেখছো? সুমিত্রা প্রদীপের দিকে তাকিয়ে হাসে।

তোমর রূপ, কী সুন্দর দেখতে হয়েছো তুমি!

তাই নাকি!

প্রদীপ প্রায়ই ভাবে তার সন্তানের কথা। তাকে মানুষের মতো মানুষ ক'রে তুলবে সে! ঐশ্বর্যের মোহে কখনই সে অন্ধ হ'য়ে যাবে না। ঘৃণা করবে তাদের যারা দস্যুর মতো শুষে নেয় দরিদ্রের অর্থ। এই অসহ্য শোষণ বন্ধ করে দেবে তার সন্তান। প্রদীপের যে বিরাট স্বপ্ন পারিপার্শ্বিক সাহায্যের অভাবে সফল হ'তে পারলো না তার সন্তান সমস্ত তুচ্ছ করে সফল করবে সে স্বপ্ন। তাকে প্রাণ দিয়ে শিক্ষিত করবে প্রদীপ।

আমার ছেলেকে আমি বিলাত পাঠাবো সুমিত্রা।

হঠাৎ?

পৃথিবীর সর্বোচ্চ শিক্ষা সে পাবে।

তারপর মেম বিয়ে করে আনুক আর কি!

তাতে কী হয়েছে? তবু আমার ছেলে এদেশে বাস করে মূর্খদের মতো পর হ'য়ে যাবে না—

বিলেতে গেলে ফিরতে অনেকদিন লাগে, অতোদিন বড়ো ছেলেকে ছেড়ে আমি থাকতে পারবো না।

তোমাদের মতো মায়েদের জন্যে বাঙালী ছেলেরা মানুষ হ'তে পারে না, আঁচলের তলায় রেখে তাদের সমস্ত মাটি ক'রে দাও—

বাবারে বাবা, এখন থেকেই এতো?

এখন থেকেই মানে? সময় তো হ'য়ে এল প্রায়।

সত্যিই তাই। সময় প্রায় হয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে প্রদীপ ডাক্তার নিয়ে আসে। তারা সুমিত্রাকে অনেক রকম উপদেশ দেয়। সাবধানে থাকতে বলে। আশা দিয়ে যায়, ভয়ের কোন কারণ নেই। তবু প্রদীপ ব্যস্ত হ'য়ে ওঠে। স্ত্রীকে খুব সাবধানে থাকতে বলে।

বাড়াবাড়ি ক'র না বেশি, সুমিত্রা মৃদু তিরস্কার করে।

না না তুমি কিছু জানোনা, এ সময় খুব সাবধানে থাকা উচিত, নয়তো শরীরের অনেক রকম ক্ষতি হ'তে পারে।

এতো জানলে কেমন ক'রে?

এসব তো সবাই জানে, কাল তোমাকে কয়েকটা বই এনে দেবো, পড়লে বুঝতে পারবে মা'র যত্নে আর চেষ্টায় সুন্দর শিশু জন্মায়।

তাই নাকি? সুমিত্রা হাসে।

হাসির কোন মানে হয় না, রাগের ভান করে প্রদীপ।

এমনি করেই ওদের দিন কাটে। যতই দিন যাচ্ছে ওরা ততই ছেলে-মানুষ হ'য়ে উঠছে যেন। ছেলেকে মহামানব ক'রে তোলবার জন্যে কত কল্পনাই যে ওরা করে! সারাদিন প্রদীপ আর সুমিত্রা কেবল স্বপ্ন দেখে। ওরা ঠিক করে রেখেছে ছেলেকে মানুষ করবার অনেক নতুন প্রথা। সাধারণ বাঙালীদের মতো ক'রে ওরা নিজের ছেলেকে মানুষ হতে দেবে

না। তার রুচি হবে উন্নত, মার্জিত। কথায়-বার্তায় শিক্ষায়-দীক্ষায় সে সাধারণ বাঙালী ছেলেদের ছাড়িয়ে যাবে।

দেখ, প্রদীপ হঠাৎ বলে, আমার ছেলেকে মারতে পারবে না কখনও।

ছেলে কী তোমার একার নাকি? বেশ করবো মারবো।

ভালো হবে না বলছি তাহ'লে।

দেখা যাক্ কি হয়!

আশায় আর কল্পনায় অনেকদিন কাটলো। তারপর একদিন দেখা গেল অতিথি আসার সময় হয়েছে। বাতাসে মিষ্টি ফুলের গন্ধ!

বাইরের ঘরে প্রদীপ একা প্রহর গুনছে। মাঝে মাঝে সুমিত্রার আর্ত চিৎকার ভেসে আসে। সুমিত্রার ঘরে ডাক্তার আর সুপ্রসিদ্ধ লেডী ডাক্তার। বাড়িময় ব্যস্ততা। প্রতীক্ষাকাতর প্রদীপ। এখুনি ছেলের কান্না শোনা যাবে। প্রদীপের সারা দেহে রোমাঞ্চ লাগে।

আসুন প্রদীপবাবু, ছেলে হয়েছে। কনগ্রাচুলেশনস্! লেডী ডাক্তার খবর দিলো।

লাফ দিয়ে ছুটে এলো প্রদীপ সুমিত্রার ঘরে। আর সংগে সংগে কে যেন তাকে চাবুক মারলো!

সে স্পষ্ট দেখলো তার ছেলের দুই চোখ একেবারে অন্ধ আর সমস্ত শরীরে বীভৎস বিকৃতি!

বৃহস্পতিবার রাত্রি　　৪ঠা কার্তিক, ১৩৫০　　কলিকাতা

বিক্রয়

শঙ্করনাথের ঘুম ভাঙলো। ঘুম ভাঙলেও অন্ন আহরণের চিন্তা পীড়িত করে না তাঁর মুহূর্তগুলিকে। কয়েকটা হাই তুলে শঙ্করনাথ উঠে বসলেন। তারপর মন্থর পদক্ষেপে এসে দাঁড়ালেন সামনের খোলা বারান্দায়।

ফুটপাথে অসংখ্য ক্ষুধার্ত রমণীর ভিড়। কণ্ট্রোল্ 'সপে'র কার্ডের প্রয়োজন তাদের। তাই তারা ভিড় করেছে এখানে। শঙ্করনাথ সমাজের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি। তাঁর জীবনের ব্রত দরিদ্রের সেবা করা। র‍্যাশন্ কার্ড বিতরণের ভার পড়েছে তাঁর ওপর। সাগ্রহে স্বেচ্ছায় তিনি গ্রহণ করেছেন সে ভার!

শঙ্করনাথের চোখ জলতে লাগলো। তিনি কিছু একটা লক্ষ্য করবার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু বড়ো বেশি অন্ধকার। মনের বিরক্তি গোপন করে কিসের তাড়নায় তিনি নিচে নেমে এলেন।

হয়তো আর্তনাদ থেমে যেতো, জাগতো কোলাহল যদি ওই বুভুক্ষু মুমূর্ষু রমণী ও শিশুর দল লক্ষ্য করতো শঙ্করনাথকে। অন্ধকারের আবরণ আড়াল করে রেখেছিল তাঁকে। মিনিট কয়েক স্তব্ধ হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর হৃৎপিণ্ডটাকে কে যেন মুচড়ে দুমড়ে দিলো। তাঁর ইচ্ছে হ'লো এতোদিন যা কিছু সঞ্চয় করেছেন সমস্ত উজাড় করে এদের মাঝে বিলিয়ে দিতে! পৃথিবীর এই বিকৃত রূপ কিছুতেই তিনি যেন সহ্য করতে পারছিলেন না। আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আকাশে আলোর রেখা দিলো।

এতোক্ষণ পরে চাঁপা স্পষ্ট দেখতে পেলো তার ছেলের করুণ কচি মুখ। চোখে জল চিক্ চিক্ ক'রছে, পেট গেছে ঝুলে, কান্নায় কণ্ঠও বুঝি রুদ্ধ হয়ে গেছে। যুবতী চাঁপার চোখের অসহায় দৃষ্টি শঙ্করনাথকে বিচলিত করলো।

ক'দিন খাসনি তোরা ? তিনি এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন ।

শঙ্করনাথের দৃষ্টির সামনে শিউরে উঠে সন্ত্রস্ত হয়ে চাঁপা মাথায় ঘোমটা আর একটু নামিয়ে দিলো । কোন উত্তর দিলো না ।

খেতে পাস না এখনও লজ্জা ? যা জিজ্ঞেস করছি উত্তর দে, ক'দিন খাসনি ? নিজের হাতেই শঙ্করনাথ চাঁপার ঘোমটা সরিয়ে দিলেন ।

বাবু ! চাঁপার ভীত কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হল । শঙ্করনাথের এ দৃষ্টি তার অপরিচিত নয় ।

কার্ড চাই তো ?

না না, এ লোকের হাত থেকে কার্ড নিতে সে কিছুতেই পারবে না ।

অকস্মাৎ চাঁপার সচেতনতা ক্ষুধার জ্বালা ভুলিয়ে দিলো । প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে সেই সারি ছেড়ে পথের একপ্রান্তে এসে সে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললো ।

শঙ্করনাথ মুচকি হাসলেন । স্পষ্ট দিনের আলোয় তাঁর চোখ থেকে স্বল্প অন্ধকারে দেখা পৃথিবীর বিকৃত রূপ মুছে গেলো । বহুদিনের উপবাসী অন্তর দিয়ে তিনি দেখলেন যৌবন উজ্জ্বল যুবতীদের । অনাহার আর অনিদ্রা এখনো তাদের যৌবনের জৌলুস একেবারে ম্লান করতে পারেনি । এক এক জনের কাছে কার্ড নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন ।

কার্ড বিতরণ করতে করতে তিনি চেয়ে দেখেন তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে শীর্ণ যুবতীদের মুখে আর শিশুর কোলাহল বেড়ে গেছে । গভীর শান্তি ভ'রে তুললো তাঁর সারা মন ।

আকাশে সূর্য উঠলো !

কিন্তু ছেলেটাকে কিছুতেই চুপ করানো গেলো না ।

এই হাহাকার—অভাবের এই ক্রন্দন, কতকটা আসন্ন প্রসবার আর্তনাদের মতো । দিক্-দিগন্তে বিপুল সম্ভাবনার সঙ্কেত । সে কথা চাঁপা বোঝে না, বোঝবার কথাও নয় শুধু সব সময় তার মনে পড়ে শয্যাশায়ী স্বামীর মুখ আর কানে বাজে ক্ষুধার্ত সন্তানের করুণ ক্রন্দন ।

বিড় বিড় করে সে যেন কাকে অভিশাপ দেয় ! বিংশ শতাব্দীর বর্তমান

জ্বালাময় আসরে সে-অভিশাপ ছাই হয়ে হাওয়ায় উড়ে যায়। কানে পৌঁছায় না কারুর। তবু চাঁপা ভয়ংকর অভিশাপ দেয়।

চুপ কর, চুপ কর, আর পারি না বাপু—এক এক সময় চাঁপার ইচ্ছে হয় গলাটা টিপে সব শেষ ক'রে দিতে। বিগত কয়েক দিনে এমন অনেক মুহূর্ত তার জীবনে এসে পড়েছিলো। এ'কদিন কেটেছে কেবল পথ চলায়। অনেক ক্রোশ অতিক্রম ক'রে তারপর তাকে শহরে আসতে হয়েছে; অন্নের আশায়—ক্ষুধার জ্বালায়।

বহু দরজায় অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেও যখন কিছু মিল্‌লো না তখন সত্যিই তার ক্লান্ত অবসন্ন দেহ বিকৃত শৈথিল্যে ভেঙে পড়লো। তবু তাকে বাঁচতে হবে; এই নির্মম জ্বালা নিয়েও অন্ন আহরণ করতে হবে।

পর মুহূর্তেই তার মনে পড়ে সেই ভয়ংকর কুৎসিত দৃষ্টি। এসবে অভ্যস্ত চাঁপা—এমন অনেক দৃষ্টিকে অতিক্রম ক'রে শহরে প্রবেশ করেছে সে। প্রাণ যায় ক্ষতি নেই—নারীত্বের গর্বকে সে ক্ষুণ্ণ হ'তে দেবে না কোনমতেই। প্রয়োজন হলে শিশুকে হত্যা করতেও সে কুণ্ঠিত হবে না। কিন্তু স্বামীর কথা মনে হওয়ার সংগে সংগেই তার সমস্ত কিছু যেন গোলমাল হ'য়ে গেলো।

শ্রীপদ শয্যাশায়ী। বিপদ যখন আসে তখন একা আসে না—এই ক'দিনে এ'কথার সত্যতা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে চাঁপা। কারখানায় কাজ করলে পা'ও যে কাটা যেতে পারে তা' সে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। যদি বুঝতে পারতো তা'হলে ওখানে চাকরির জন্যে শ্রীপদকে এমন করে পীড়াপীড়ি ক'রতো না। আর কোনদিনও হয়তো শ্রীপদ শয্যা ছেড়ে উঠতে পারবে না। তাই আহার্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হয়েছে চাঁপাকে।

না না, তুমি কিছুতেই যেতে পারবে না, শ্রীপদর ব্যাকুল কণ্ঠস্বর চাঁপার কানে ভেসে এলো যেন।

কিন্তু না গেলে চলবেই বা কেমন করে বল?

সে আমি যা হয় করবো, তোমায় ভাবতে হবে না।

ঘরে কিছু নেই, চাঁপা আস্তে আস্তে উত্তর দিয়েছিলো, বিকেল থেকে ছেলেটার মুখে কিছু দিতে পারবো না—

ভিক্ষে করবো আমি, শ্রীপদ বলছিলো।

তুমি তো উঠতে পারবে না, বড়লোকের বাড়িতেই চাল নেই, এ গাঁয়ে তোমায় ভিক্ষে দেবে কে? ছেলেটাকে কি না খাইয়ে মারতে চাও?

শ্রীপদ কোন উত্তর দিতে পারে নি, চাঁপার কথায় একেবারে গুম হয়ে গিয়েছিল। আর চাঁপা যখন বেরিয়ে আসে শুধু সেই মুহূর্তে ও একবার চিৎকার করে উঠেছিলো! সেটা বোধ হয় আর্তনাদ। হ্যাঁ, চাঁপা বুঝতে পেরেছে স্বামীর ভাঙা পা আর কোনদিনও জোড়া লাগবে না।

সন্ধ্যার অন্ধকার আচ্ছন্ন করলো দিগন্ত। আজও সারাদিন উপবাসের পর চাঁপার নারীত্বের গর্ব বিন্দুমাত্র খর্ব হয়নি।

হয়তো ছেলেটার ক্রন্দন আর একটু পরে একেবারেই থেমে যাবে; ক্ষুধার যন্ত্রণায় দীর্ণ কণ্ঠে আর কোনদিনও সে চিৎকার করে উঠবে না। চাঁপা আঁকড়ে ধরলো ছেলেটাকে। সর্বাংগ দিয়ে সে অনুভব করতে চায় তাকে। ওকে চোখের সামনে তুলে নিয়ে চাঁপা দেখলো অনাহারে শীর্ণ কচি মুখ কী ভীষণ হ'য়ে উঠেছে! সে লক্ষ্য করলো তার চোখ দুটো বন্ধ হয়ে এসেছে, ক্রন্দনের উৎসাহও আর নেই। শিশুর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে একটা বিকট নির্বিকার রূপ। সে বুঝতে পারলো এ শেষ হ'য়ে যাবে এখনই। সমস্ত শক্তি দিয়ে বুকের মাঝে তাকে চেপে ধরলো চাঁপা আর সেই মুহূর্তে সে অনুভব করলো এর চেয়ে বড়ো তার কাছে আর কিছু নয়।

চারপাশে গভীর কালো অন্ধকার। কোন কোলাহল কানে আসে না। আলোর রেখাও নেই কোথাও। বোধ হয় অমাবস্যা।

ছেলেটাকে কিছু খেতে দেবেন বাবু?

হল্লা আর হাসিতে চারপাশ মুখরিত করে লোকগুলো চলে গেলো। তাদের মধ্যে কেউ সজোরে একটা ধাক্কা দিয়ে গেলো চাঁপাকে। সে বুঝতে পারলো সেই গভীর অন্ধকারও তার যৌবনের দীপ্তি ম্লান করতে পারেনি।

বোধ হয় শেষবারের জন্যে প্রাণপণ শক্তিতে ছেলেটা আবার চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠলো। চাঁপার বুক চিরে বসে গেলো সেই ক্রন্দন। সারাদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরেও একমুঠো চালও তার যোগাড় হয় নি; শেষ সম্বল যে আট আনা নিয়ে সে বেরিয়েছিলো, পথে পথেই তা' শেষ হয়ে গেছে। হয়তো আজ সকালে বিনামূল্যেই শঙ্করনাথের কাছ থেকে কার্ড পাওয়া যেতো সেই আশাতেই চাঁপা হাজির হয়েছিলো সেখানে।

বড়ো বেশি কাঁদছে ছেলেটা। আর সহ্য করা যাচ্ছে না। ভীষণ ভয় পেলো চাঁপা। ওর মনে হ'লো আস্তে আস্তে ছেলেটা শেষ হ'য়ে যাচ্ছে, একটা অব্যক্ত যন্ত্রণায় চাঁপার সমস্ত শরীর কাঁপতে আরম্ভ করলো।

অকস্মাৎ চাঁপার মাথাটা ঝিম্ ঝিম্ করতে লাগলো। তবে কি তাকে আবার যেতে হবে সেই শঙ্করনাথের কাছে? কোথায় রইলো তার নারীত্বের গর্ব? ছেলের মুখে যে অন্ন তুলে দিতে পারে না তার গর্বের মূল্য কী?

কিন্তু ওঃ! কী ভীষণ ক্ষিধে! পায়ের তলার মাটি, ঘর বাড়ি—এই পৃথিবী কামড়ে কুরে কুরে খেতে ইচ্ছে করছে চাঁপার—আর এক মুহূর্তও সে বোধ হয় অনাহারে কাটাতে পারবে না। পৃথিবী দুলতে লাগলো তার কাছে। না না, এমনভাবে অজ্ঞান হ'য়ে গেলে চলবে না। ভগবানকে সারা মন প্রাণ দিয়ে সে আহ্বান করলো একবার। আরো কিছু পথ তাকে অতিক্রম করতে হবে। বাঁচতেই হবে তাকে—বাঁচাতেই হবে তার নিজের সন্তানকে। বিকল যন্ত্রের মতো অতি কষ্টে সে পথ চলতে লাগলো।

ঠিক তেমনি ক'রে অন্ধকারে আবার নেমে এলেন শঙ্করনাথ। অসংখ্য কণ্ঠের কোলাহল ভেসে আসছে। সারা পৃথিবীর ক্ষুধা যেন মূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে। স্তব্ধ হ'য়ে শঙ্করনাথ দাঁড়িয়ে রইলেন। আজকের ভিড়টা আরো বেশি মনে হচ্ছে যেন। তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে শঙ্করনাথ লক্ষ্য করছিলেন। সেই অন্ধকারেও মনে হ'ল কে যেন তাঁর দিকে অতি দ্রুত এগিয়ে আসছে।

পরমুহূর্তেই শঙ্করনাথের পায়ের ওপর আছড়ে পড়লো চাঁপা, আপনার যা ইচ্ছে করুন বাবু, আমায় দু'টো খেতে দিন—ছেলেটাকে বাঁচান!

চারপাশে শেষ রাত্রির তরল অন্ধকার!

বুধবার রাত্রি ১৫ই ভাদ্র, ১৩৫০ কলিকাতা

উপসংহার

শুধু বৃদ্ধ বলদের মতো ম্লান সংসারে দিনের পর দিন ঘোরা !

সেই জীর্ণ অট্টালিকার হয়তো একটা সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে। কিন্তু সে ইতিহাস নিয়ে তারাদাসবাবু মাথা ঘামান না। শুধু যখন দিনের আলোয় প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে নিতান্ত অকারণেই তাঁর শিরাগুলো দপ্‌দপ্‌ করে আর মাথায় অসহ্য চাপ অনুভব করেন তখন প্রায়ই মনে হয় এই অট্টালিকার সংগে তাঁরও বেশ মিল আছে।

কিন্তু সেকথা আজ কে মনে রাখে? এই বৃদ্ধ জরাজীর্ণ অট্টালিকারও একদিন যৌবন ছিল, তখন এখানে গ্যাসের তীব্র উজ্জ্বল আলো জ্বলতো, গ্লাসের টুংটাং শব্দের সংগে বাইজীর গান ভেসে আসতো। চারপাশে স্বাস্থ্য ছিল, প্রাণ ছিল, দেয়ালে দেয়ালে সম্পদের হরেক রঙ লেগে ছিল—তখন অট্টালিকার উজ্জ্বল যৌবন।

শ্লথ গতিতে বার্ধক্য এলো। আজ তারাদাসবাবুর চুলে পাক ধরেছে, দেহে এসেছে শৈথিল্য, গায়ের চামড়া গেছে ঝুলে। আর কি আশ্চর্য মাঝে মাঝে তিনি অবাক হয়ে ভাবেন চারপাশে যেদিকে তিনি তাকান সব দিকেই যেন বার্ধক্য নেমেছে। এই অট্টালিকায়, তাঁর নিজের দেহে-মনে স্ত্রীর শরীরে তাঁর সংসারে—সব দিকে। তারাদাসবাবুর যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।

শুধু ছেলেটা একমাত্র ব্যতিক্রম। তার এখন জ্বলন্ত যৌবন, আর এত বেশী সেই যৌবনের উচ্ছলতা যে তারাদাসবাবু কপাল কুঁচকে ভাবেন বোধ হয় এই জরা-জীর্ণ বাড়ী তাকে ধরতে পারে না। সমস্ত দিনরাত্রির মধ্যে তারাদাসবাবু শোভনলালের টিকিটিও দেখতে পান না। যাক্‌গে আর ওসব অভিভাবকগিরি করতে ইচ্ছে হয় না তাঁর। যা হয় হোক, আর একবার নিশ্বাস ফেলে তিনি ভাবেন যা হবার তাতো হয়েই গেছে কিছু কি আর বুঝি না, আমারই তো ছেলে তুমি ! কিন্তু এমন করে আর কতদিন চলবে ! এই শুকনো জরা আর

বার্ধক্য বহন করে ধুঁকতে ধুঁকতে এমনি করেই কি তিনি শেষ হয়ে যাবেন ! দুত্তোর—তারাদাসবাবুর রক্তের চাপ বেড়ে যায়।

বাড়িটারও কি রক্তের চাপ বাড়ে ! ওটা বোধ হয় একেবারে কানা কালা আর স্থবির হয়ে গেছে—মনে মনে নাকি শোভনলালকে বাহবা দেয়। কিন্তু বাড়ির বাহবা নিয়ে তারাদাস ছাড়া আর কে-ই বা মাথা ঘামায় আর তার দামই বা কি ! কিছুই তো শেষ অবধি রাখা গেল না ! বুলবুলি গেল, ফুলমণি হাত-ছাড়া হয়ে গেল—এখন এই বুড়ো বাইজী বাড়িটাকে রেখে লাভ কি। ওটারও তো সময় হয়ে এলো—খাওয়া পরা আর রঙ মাখার পয়সা না দিলে বাইজী থাকবে কেন ! তবু শোভনলালকে দেখলে মনে হয় সবই আছে সবই থাকবে, সবই রাখা যায়। আহা ছেলেটি আমার খাসা !

হঠাৎ বাড়িটাও যেন চমকে উঠলো। বাহবা দেওয়া ছেড়ে দিয়ে সত্য-বতীর তীক্ষ্ম স্বর শুনে সেও যেন বেশ বিচলিত হয়ে উঠলো। তবু রক্ষে সে শুধু শুনেই আসছে, তর্ক করে না, বাধা দেয় না—শুধু জমা করে রাখে, কত বছরের কত কথা প্রত্যেকটি দেয়ালের আনাচে-কানাচে জমা হয়ে আছে কে তার হিসেব রাখে !

কান্নামেশানো গলায় প্রায় চিৎকার করে সত্যবতী বললো, ছেলের বিছানার তলা থেকে মদের বোতল বেরিয়েছে তুমি কি এখনও বসে ঝিমোবে ? জানো, রাত্তিরেও সে আজকাল বাড়ী থাকে না—

আহা ব্যস্ত হচ্ছ কেন, বয়সটা দেখতে হবে তো ! থাক্ থাক্, কিছু বল না, আমরা তো ওর মতো বয়সে—

থাক্, তোমার ইতিহাস আর নতুন করে শোনাতে হবে না। পাঁচটা নয়, সাতটা নয়, ওই একটি মাত্র ছেলে আমার—

দীর্ঘজীবী হোক গিন্নী, বেঁচে থাক্, ওকে যতই দেখি ততই যেন আমার আরও বেশি বাঁচতে ইচ্ছে করে।

তাতো করবেই। সাধে আর ছেলে বকেছে, রক্তের দোষ।

ঠিক বলেছো গিন্নী, রক্তের দোষ, ও বয়সের রক্ত বড় গরম !

থামো, আমারও যেমন পোড়া কপাল, তোমার কাছে এসেছি এইসব বলতে—মরণও হয় না আমার, বোধহয় চোখের জল চেপে সত্যবতী চলে গেল।

বাড়িটা বোধহয় একটু অবাক হয়েছে। তার দরজায় কাবুলী লাঠি ঠোকে কেন! এই বোধ হয় প্রথমবার। তারাদাসবাবু চুপ করে বাইরে তাকিয়ে আবার তাড়াতাড়ি মুখ লুকিয়ে নিলেন। না, কাবুলীর কথা তো তাঁর ঠিক মনে পড়ে না। এরা নাকি টাকা ধার দেয়। অনেক—অনেক টাকা, কত—যত চাওয়া যায় তত? তাহলে তো আবার নতুন করে বেঁচে ওঠা যায়। আবার ঠিক তেমনি করে গরদের ধুতি-পাঞ্জাবী, আবার সেই, "বাহুর ডোরে ধরি আমি" —বাড়িটা এবার যেন হেসে উঠলো।

শোভনলাল সেজেগুজে বেরিয়ে যাচ্ছে। টক্‌টকে ফর্সা রঙ—স্বাস্থ্য যেন ফেটে পড়ছে। আহা, কী সুন্দর দেখাচ্ছে আজ ওকে! ধবধবে ধুতি আর কলার তোলা সিল্কের সার্ট দেখে তারাদাসবাবুর অনেক কথাই মনে পড়ে গেল। সেন্টের মিষ্টি গন্ধে এক মুহূর্তে যেন ঘরের হাওয়া বদলে গেল। তারাদাসবাবু তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

কী হে চলেছো কোথায়?

যাই একটু ঘুরে-টুরে আসি।

যাবেই তো যাবেই তো, কিন্তু রাত্তিরেও তুমি নাকি আজকাল বাড়ি থাকো না—কোথায় যাও?

এক বন্ধুর বাড়ি যাই, তাদের খোলা ছাদে শুতে ভাল লাগে—এখানে যা গরম! ফ্যান্‌-ট্যান তো আর নেই তোমাদের—

কিন্তু ছাদ তো এখানেও আছে।

তা' আছে, তবে এত বেশি নোংরা যে শুলে অসুখ করবে. বন্ধুর ছাদ একেবারে ঝকঝকে আর অনেক বেশি হাওয়া—আচ্ছা,—শোভনলাল গট্‌গট্‌ করে বেরিয়ে গেল।

বাঃ, সাবাস! তারাদাসবাবু বাহবা দিলেন—এইতো যুবক! হঠাৎ তাঁরও যেন এই বাড়িটার মধ্যে বড়ো বেশি গরম মনে হলো।

ওদিকে বাড়িটা সত্যিই এবার হতভম্ব হয়ে গেছে! তারাদাসবাবু স্পষ্ট দেখতে পেলেন সেই কাবুলীওয়ালার গলা জড়িয়ে শোভনলাল চলেছে।

তবু অজান্তে কোন ফাঁকে যেন রঙ লেগে থাকে।

তারাদাসবাবুর হঠাৎ নেশা লাগে—তিনি যেন কিসের গন্ধ পান। আস্তে আস্তে তিনি ওপরে উঠতে লাগলেন। জীর্ণ সিঁড়ি, খুব সাবধানে চলতে হয়

তাঁকে। বেশি ভার সহ্য করবার ক্ষমতা সিঁড়ির থাকবেই বা কেমন করে! অবশিষ্ট আছে তো শুধু হাড় ক'খানা!

এই অনধিকার প্রবেশের জন্য সমস্ত বাড়িটা যেন হাঁ হাঁ করে উঠলো, আঃ তুমি আবার এখানে কেন? সাবধান কেউ যেন দেখতে না পায়।

চোরের মত শোভনলালের ঘরে এসে তারাদাসবাবু থমকে দাঁড়ালেন। এ ঘরের গন্ধ যেন জড়িয়ে ধরতে চায়। টেবিলের ওপর রজনীগন্ধা, তার পাশে রূপোর ছাইদান আর ধবধবে টেবিলের চাদর। আর ওই ছবিটা কার—এই তো নীচে লেখা আছে, চামেলী। তারাদাসবাবুর বুড়ো রক্তে যেন নতুন করে বান ডাকলো। কোথায় লাগে বুলবুলি আর ফুলমণি! আহাহা, এই তো জিনিস একখানি! বেঁচে থাক ছেলে আমার, বলিহারী তোমার নজরকে!

ওদিকে আপনমনেই যেন বাড়িটা বলে উঠলো, ফুলমণির কাছে এরা লাগবে কেন! দেখতে পাওনা হাওয়া বদলাচ্ছে—দেখতে পাওনা শোভন লালকে!

দেখতে পান বৈকি তারাদাসবাবু, সবই দেখতে পান। কিন্তু তিনি শুধু ভাবতে লাগলেন, এদের মতো সব আমাদের আমলে ছিল কোথায়!

এখনও তো আছে, যাওনা তারাদাস! না-হয় একটু বুড়োই হয়েছ। চুল পাকা কিছু নয়, সব ঠিক করে নেওয়া যায়। বাহারী হাড়ের লাঠিটা তো এখনও ভাঙা আলমারীর মাথায় আছে—সেটা হাতে নিয়ে রাস্তায় বেরোলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। বাড়িটা কি তারাদাসবাবুর সংগে রসিকতা করছে! রসিকতা কেন! ঠিকই তো, বাহারী হাড়ের লাঠিটা এখনো আছে বটে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে চোরের মতো তারাদাসবাবু ফ্রেমে রাখা চামেলীর ছবিটাকে নানাভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। হঠাৎ এক সময় ড্রয়ারটা খুলেই তারাদাসবাবু আবার বন্ধ করে দিলেন। একি বিশ্বাস করা যায়! অনেক হবে, গুনতে গেলে বেশ কিছু সময়ের দরকার।

শুধু বৃদ্ধ বলদের মতো ম্লান সংসারে দিনের পর দিন ঘোরা। দুত্তোর! তারাদাসবাবুর রক্তের চাপ বেড়ে যায়।

এই অট্টালিকার রূপ তো আজও বদলে দেওয়া যায়। চোখ বন্ধ করে তারাদাসবাবু বাড়িটার আগাগোড়া চেহারা একবার ভাবতে চেষ্টা করলেন।

একেবারে বাইরে থেকেই ধরা যাক।

গেট্ দুটো ভেঙে পড়েছে। আজ ওটাকে আবর্জনার মতো মনে হয়। কিন্তু বিশেষ কিছুই নয়।৹ শুধু যদি কয়েকজন মিস্তিরী একটু উৎসাহের সংগে কাজ করে, তাহলে তো দু' ঘন্টার মধ্যে ওটা আবার ঠিক হয়ে যায়। আবার তখন গেট্ পার হয়ে বড়ো বড়ো গাড়ি অনায়াসেই ভেতরে আসতে পারে। আর গাড়ি বারান্দার জন্যে এমন কিছু পরিশ্রম করতে হবে না—একবার শুধু চুনকাম করে নিলেই চলবে। চোখ বুজে তিনি আরও কল্পনা করতে লাগলেন, আর জানলা-দরজার ভাঙা কাচগুলো বদলে দিয়ে, সিঁড়ির রেলিঙে পালিস লাগাতে হবে। বাইরে যেখানে যেখানে ফাটল ধরেছে, সমস্ত বুজিয়ে ফেলে তারপর আগাগোড়া তাজা লাল রঙ মাখাতে হবে বাড়িটার গায়ে। ব্যস্, তাহলে ওটা আবার খাড়া হয়ে উঠবে—আবার ঠিক তেমনি ঝলমল করবে আর প্রাণের প্রাচুর্যে চারদিক যেন উছলে উঠবে।

তখন তারাদাসবাবুকে পাওয়া যাবে কোথায়? হয়তো ছাদের ঘরে। শোভনলালের ঘরের পাশে নতুন আর একটা প্রকাণ্ড ঝক্‌ঝকে ঘর উঠেছে সেই ঘরে তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে—না না তাকিয়া কেন, পুরু গদিওয়ালা সোফায় তিনি বসে আছেন। একটাও পাকা চুল দেখা যাচ্ছে না, বোঝা যাচ্ছে নোট আর টাকায় পকেট বেশ ভারী হয়ে উঠেছে আর—তারাদাসবাবু খুব সাবধানে এদিক-ওদিক তাকিয়ে নিলেন, আর তার পাশে বসে চামেলী, সেই ছবির মতো কানে বড়ো বড়ো দুল—

ছি ছি ছি তারাদাস, বয়স হয়েছে না? শোভন কী ভাববে? তারাদাসবাবুর মনের কথা জানতে পেরে বাড়িটাও যেন লজ্জা করতে লাগলো।

রাত কতো ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দুটো বিরাট পাশবালিশের মধ্যে শুয়ে তারাদাসবাবুর মনে হচ্ছে মাথাটা আজ যেন একটু বেশি দপ দপ করছে, আর সেই দপ দপানি তাঁর মাথায় কেবলই ঘা মারছে। এক-একটি আঘাত তারাদাস বাবু স্পষ্ট অনুভব করছেন। হঠাৎ আজ যেন তাঁর অনুভূতিও বড়ো বেশি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। মনে হচ্ছে একটা বিশেষ পোকা যেন তাঁর মাথার মধ্যে ঘুরে

ফিরে বার বার করর্ করর্ শব্দ করছে। জীর্ণ পুরানো নির্জন ঘরে একা তিনি শুধু ছটকট করছেন। ঘুমও আসে না ছাই!

তবু বাইরে জ্যোৎস্না উচ্ছলতায় ভরে উঠেছে। তারাদাসবাবু কখনও এমন তীক্ষ্ণ সজাগ ইন্দ্রিয় দিয়ে উপলব্ধি করেন নি যে, এই প্রাণময় আলোর ফাঁকে ফাঁকে যেন লক্ষ প্রাণের দুর্বার স্পন্দন নিরন্তর তাঁকে ডাকে। তিনি সে আহ্বান শুনতে পাচ্ছেন, কিন্তু সাড়া দিতে পারছেন না। তিনি সমস্তই দেখতে পাচ্ছেন, কিন্তু চারপাশে কেমন যেন একটা ভাসা-ভাসা ছাড়া-ছাড়া ভাব—কিছুই গ্রহণ করতে পারছেন না। শুধু মাথার সেই পোকাটা করর্‌করর্ করছে। সে-শব্দ ছাড়া আর কোথাও যেন কোন শব্দ নেই—চারধার নিঝুম। অসহ্য অব্যক্ত যন্ত্রণায় তিনি শুধু এধার ওধার করতে লাগলেন।

সেই গম্ভীর নিস্তব্ধ রাত্রেও বিশ্বাসী বৃদ্ধ প্রহরীর মতো শুধু যেন বাড়িটা জেগে আছে। নাহলে এমন করে কে আর অভ্যর্থনা করবে! তারাদাসবাবু যেন স্পষ্ট স্বর শুনতে পেলেন, এসো এসো! বাড়ির সংগে সংগে স্তিমিত আলোর প্রত্যেকটি কণিকা যেন কথা বলে উঠলো, এসো এসো, আয় আয়—

তারাদাসবাবু বুঝতে পারলেন শোভনলাল ফিরেছে।

রিক্সাওয়ালার স্বর শোনা গেল, নেহি বাবু ই নেহি লেগা—

নেশায় জড়ানো স্বরে শোভনলাল বললো, কাহে? আঠ্ আনা যাস্তি হো গিয়া, নিকাল্ যাও উল্লু!

আউর চার আনা খুশিসে দিজিয়ে বাবু—

হাঁ, ওই বাত বলো, হাম খুশিসে দেগা। বহুৎ আচ্ছা আদমী হ্যয় তোম্, লেও, যাও ভাগো উল্লু—

রিক্সার ঠুন ঠুন শব্দ মিলিয়ে গেল। ঘরের দেয়ালগুলো রিমঝিম করে উঠলো যেন। তারারাসবাবু বুঝতে পারলেন, গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে শোভনলাল ভেতরে ঢুকলো। তিনিও মনে মনে অভ্যর্থনা জানালেন তাকে।

কিন্তু মাঝপথে হঠাৎ যেন ছন্দপতন হলো। সত্যি এসব ভাল লাগে না তারাদাসবাবুর। শোভনলালকে নিয়ে সত্যবতীর শুধু শুধু এই বাড়াবাড়ি করবার কি দরকার। তর্কাতর্কি এই বয়সে কারই বা ভাল লাগে। তবু

তাদের এই প্রত্যেকটি কথা তাঁর কানে এসে লাগলো। তারাদাসবাবু অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

ছি ছি এই অবস্থায় রাত্তির বেলা মা-বাপের কাছে মুখ দেখাতে তোমার একটু লজ্জা করে না শোভন?

জড়ানো স্বরে শোভনলাল বললো, কে মুখ দেখবার জন্যে বসে থাকতে বলে তোমাদের?

থামো, অসভ্যের মতো কথা বললে থাবড়া মেরে মুখ ভেঙে দেবো তোমার, পাজী বদমাইস কোথাকার।

আঃ, এই রাত্তিরে কেন গাল দিচ্ছ মা? অনেক তো দিয়েছ। শান্তি, শুধু শান্তি, আমাকে একটু নিরিবিলিতে যেতে দাও, এই আমি তোমার পায়ে পড়ি মা—আমার মা!

শোভনলাল নিজের ঘরের দিকে যাচ্ছিল রাস্তা আটকে বাধা দিয়ে সত্যবতী বললো, মনে থাকে যেন—এই শেষবার ফের যদি এমন অবস্থায় তুমি বাড়ী আস তোমাকে আমি বের করে দেবো। এভাবে উচ্ছন্নে যেতে লজ্জা করে না তোমার? দেখতে পাওনা ভাবনায়-ভাবনায় তোমার বাবার হাড় বেরিয়ে যাচ্ছে? দেখতে পাওনা কিভাবে আমি দিন কাটাই? ধোপা খরচের ভয়ে পরিষ্কার কাপড় পর্যন্ত পরতে আমার বাধে আর তুমি যা-তা করে টাকা উড়িয়ে—

আঃ, চুপ কর, সব কথা হয়তো শোভনলালের কানে যায়নি। কিন্তু বাড়ি থেকে বের করে দেবার কথায় প্রমত্ত অবস্থাতেও হঠাৎ যেন তার পৌরুষ জেগে উঠলো, বাড়ি থেকে বের করে দেবে? কে চায় এই ভাঙা মরচে ধরা পচা বাড়িতে থাকতে? থাক তোমরা এখানে, আমার যাবার অনেক জায়গা আছে, দরকার মতো দুটো টাকা ধার দিতে পারো না, আবার কথা বলতে আস—

মুখ সামলে কথা বল শোভন, অকাট মুখ্যু হয়ে আছ, সেকথা ভুলে যেও না, বাড়ি থেকে বের করে দিলে জামা-জুতো পরে গান গাইতে গাইতে ঘরে ফেরা চলবে না—উপোস করে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করতে হবে—

বাঃ, অনেক জেনেছ দেখছি, রাগে শোভনলালের চোখ দুটো দপ করে উঠলো, অকাট মুখ্যু হয়ে তোমাদের পয়সা দিয়ে কাপ্তেনি করি না, তোমাদের

পয়সা ছুঁতে আমার ঘেন্না হয়—একটিমাত্র ছেলেকে কি-না রাজা করে রেখেছ সব—

অনেক হয়েছে, রাত্তির বেলা চেঁচামেচি কর না, এই শেষবার তোমাকে আমি এমন অবস্থায় বাড়ি ফিরতে বারণ করলাম, নইলে ফল ভাল হবে না—যাও আমার সামনে থেকে—

যাচ্ছি, কিন্তু শোন, তোমাদের ভুল ধারণা ভেঙে নাও! তোমাদের টাকা সত্যি আমি ছুঁই না। আমার যা সাতদিনের খরচ তোমাদের তাতে বোধ হয় দু'মাস চলে যায়—

চুরি করতে আরম্ভ করেছ?

না, উপার্জন করতে শিখেছি। আমার কাবুলী আছে—রেস আছে, তোমরা আমাকে আর কখনও টাকা দেখাতে এসো না—টলতে টলতে শোভনলাল নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিল।

আর সেই অন্ধকারে স্তব্ধ হ'য়ে সত্যবতী কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। তার শিরগুলো যেন মোচড় দিচ্ছে। আস্তে আস্তে কপালের হঠাৎ-আসা ঘাম মুছে ফেলে ঘরের চারপাশে সে একবার তাকিয়ে দেখলো। কেউ কোথাও নেই।

যাক অবশেষে শেষ হলো। তারাদাসবাবু এতক্ষণ লজ্জায় যেন মরে যাচ্ছিলেন। সত্যিই কি সত্যবতীর কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। শোভনলালকে বের করে দিতে চায়। প্রাণ চলে গেলে কী নিয়ে থাকবে বাড়ি! এই সম্ভাবনার সঙ্কেতে যেন চারদিক থম থম করছে। তারাদাসবাবু মনে মনে ঠিক করলেন সত্যবতীর সংগে আর তিনি কথা বলবেন না, সে জানে না কার সংগে কি ভাবে কথা বলতে হয়—ছি ছি!

সত্যি যদি চলে যায়? তারাদাসবাবুই বা কাকে নিয়ে থাকবেন তাহলে —এই শুকনো গহ্বরে কে বহন করে আনবে সূর্যের আলো। অনেক কষ্টে তিনি চোখ বোজবার চেষ্টা করলেন—যদি ঘুম আসে!

এতক্ষণে তাঁর মাথাটা বেশ হাল্কা হয়ে আসছে। আর কি একটা বিরাট সম্ভাবনার প্রচণ্ড তোড়ে পোকাটাও মাথার মধ্যে কর্‌র্‌ কর্‌র্‌ করছে না। আর একবার তারাদাসবাবু উঠে বসলেন এইবার তিনি নিশ্চিন্ত। শোভনলাল তাঁকে যেন বাঁচবার মন্ত্র বলে দিয়েছে, আমার কাবুলী আছে, রেস

আছে। আজ অনেক দিন পর জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তারাদাসবাবু দেখলেন স্তিমিত আলোর উজ্জল কণিকা সেই বাড়ীকেও খেয়াল-বিলাসী রূপবান পুরুষের মতো করে তুলছে আর সে যেন তারাদাসবাবুর তালে তাল মিলিয়ে বলছে, আছে আছে, শোভন আছে, কাবুলী আছে, রেস আছে, আর তুমিও থাকবে তারাদাস!

ফোকলা দাঁতে বাড়িটা হাসছে।

দাঁড়াও তারাদাস, গম্ভীর ভাঙা গলায় দেয়াল ভেদ করে স্বর ভেসে এলো, বাঃ বেশ মানিয়েছে তোমাকে! না না না, সঙ্কোচ ক'রো না, তোমাকেও রঙ লাগিয়ে খাড়া করা যায়। বুঝতে পারো না তোমার রক্তে আজও বান ডাকে! শোভনকে দেখে শেখো—আবার চাকা ঘুরবে। যাও বেড়িয়ে পড়, সোজা রাস্তা তো জেনে গেছ!

আর একবার চিরুণী চালিয়ে তারাদাসবাবু বেরোতে যাবেন, এমন সময় সত্যবতী জিজ্ঞেস করলো, এই শরীর নিয়ে কোথায় বেরোচ্ছ এখন?

যাই একটু ঘুরে-টুরে আসি—

খুব সাবধান, দিনকাল খারাপ, একটু সাবধানে রাস্তা চলো।

হেসে তারাদাসবাবু উত্তর দিলেন, সাবধানেই চলবো, রাস্তা তো আমার জানা আর ভাবনা কী গিন্নী?

কী যে হেঁয়ালী কর সব সময় বুঝি না, বাপ-বেটা দুই-ই সমান!

বেটার সমান যদি হতে পারতাম গিন্নী—মনে সেই চেষ্টাই তো করছি।

হ্যাঁ, ওটাই তো শুধু এখন বাকি আছে দু'জনে একসংগে মদ গিলে বাড়ি ফেরো—

আঃ কী যে বল, মদ-টদে আর রুচি নেই, দেখা যাক কী হয়!

ভাঙা গেট পেরিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় পেছন ফিরে তারাদাসবাবু আর একবার তাকালেন।

বাড়ির মুখে মৃদু মৃদু হাসি।

বাড়ির গম্ভীর মুখ থম্ থম্ করছে। দিনের আলোয় তার চারপাশ ঘিরে যে হাসির ছটা ছিল রাত্রের অন্ধকারে তার চিহ্নমাত্র নেই। তারাদাস-বাবুর মুখে আবার চিন্তার রেখা স্ফীত হয়ে উঠেছে। আবার সেই পোকার উপদ্রব আরম্ভ হয়েছে—সেই একটানা কর্র্ কর্র্ শব্দ।

প্রথমে তারাদাসবাবু ভেবেছিলেন শোভনলালের কাছ থেকে নেয়া নতুন মন্ত্রে সিদ্ধিলাভ করে আজই সত্যবতীকে তিনি একেবারে হতভম্ব করে দেবেন। কিন্তু ঘোড়দৌড়ে তাঁর এমন হার হবে সেকথা কে ভেবেছিল।

সত্যবতীকে দেখতে পেয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, শোভন ফেরেনি এখনও?

এ সময়ে সে কোনদিনও বাড়ি ফেরে না, কিন্তু চুলোয় যাক ও, এখন উপায়?

কিসের গিন্নী?

আমার সারা মাসের খরচ ক্যাশ বাক্স খুলে নিয়ে গেছে, কালকের বাজারের টাকা অবধি নেই। এমন করে আর তো ওর সংগে বাস করতে পারি না, ওকে চলে যেতে বল তুমি।

যাক নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। সত্যবতী তাহলে তাঁকে সন্দেহ করেনি। তারাদাসবাবু ভেবেছিলেন যে-টাকা আজ বাধ্য হয়ে নিতে হয়েছিল তার দ্বিগুণ টাকা আবার ক্যাশবাক্সে রেখে দেবেন। কিন্তু হঠাৎ সমস্ত যেন গোলমাল হয়ে গেল। শূন্য পকেটে বাড়ি ফেরবার সময় তাঁর শুধু মনে হচ্ছিল শহরের রাস্তায় যদি অনেক টাকা পড়ে থাকতো তাহলে ইচ্ছে মতো তিনি কতো টাকা কুড়িয়ে নিতে পারতেন!

সত্যবতীর দিকে তাকিয়ে তারাদাসবাবু বললেন, দরকারের সময় নিয়েছে আবার রেখে দেবেখ'ন, পরের কাছ থেকে তো আর নেয়নি।

কিন্তু এই শেষবার, আর যদি কখনও এমন হয় তাহলে তোমাদের দুজনকে এ বাড়িতে রেখে যে-দিকে দুচোখ যায় আমি চলে যাবো।

এমন কথা সত্যবতী প্রায়ই বলে। তারাদাসবাবু এসব কথায় কান দেন না। আর আজ তাঁর যেন কোন কিছুতেই মন লাগছে না। শুধু মাথার মধ্যে সেই পোকাটা কর্র্ কর্র্ করছে।

আজকাল আর বোধ হয় সেই অট্টালিকায় চমক লাগে না। নাহলে

তারাদাসবাবুও কাবুলীর গায়ে হাত দিয়ে তাকে ঠাণ্ডা করবেন কেমন করে! কিন্তু কাবুলিরা এমন কেন! হ্যাঁ, অনেক টাকা তারা দেয় বটে কিন্তু এই শোভনলাল তো কখনও বলেনি যে সময়ে-অসময়ে ঘন ঘন লাঠি ঠুকে তারা অমন কর্কশ ব্যবহার করে। না হয় সুদটা তারাদাসবাবু ঠিক সময় দিতে পারেন নি। কিন্তু তাতে এমন বিচলিত হবার কী আছে! ঘোড়ার নাড়ি-নক্ষত্র এবার তিনি ভালো করেই জেনে গেছেন—আর ভাবনা কী! শুধু আর সামান্য কিছু টাকা তার চাই।

টাকার জন্যে এত ভাবনা হয় কেন মানুষের! সর্বত্র টাকা ছড়ানো থাকে না কেন—তাহলে শুধু নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিলেই পকেট ভরে যেতো। শোভন বোধ হয় টাকা কুড়িয়ে নেয় কোথাও থেকে। সে তো এমন গালে হাত দিয়ে বাড়ির মধ্যে বসে ভাবে না। আর আশ্চর্য সে কি মন্ত্র জানে, কই কোন কাবুলী তো আর কাছে এসে এমন অসভ্যের মতো চেঁচামেচি করে না।

টাকা চাই, অনেক টাকা চাই। তারাদাসবাবু চারপাশে তাকিয়ে দেখলেন, ওই দেয়াল ফুটো করলে যদি টাকার থলি বেরিয়ে আসতো—এই বিছানার গদি যদি তুলোর বদলে টাকা দিয়ে তৈরি হোত—ওই মশারির ওপর যদি নোট উড়ে এসে পড়তো—টাকা, টাকা, টাকা—ডানদিকে—বাঁদিকে, এদিকে ওদিকে চারপাশে টাকা!

পোকাটা মাথার মধ্যে করর্ করর্ করছে।

ওই বাড়িটাকেই তারাদাসবাবুর যত বেশি ভয়।

পাবে, পাবে, তোমার টাকা তুমি পাবে, অনেক টাকা তুমি পাবে আর কয়েকটা দিন সবুর কর—

নেহি নেহি, আভ্ ভি নিকালো রূপেয়া—

কিছুতেই তারাদাসবাবু এই বেয়াড়া কাবুলীটাকে শান্ত করতে পারলেন না।

আহা, আস্তে, আমি কি তোমার টাকা মেরে দোব?

কেয়া বোলতা হায়? জোরে লাঠি ঠুকে কাবুলী বললো, দো মোহিনাকা সুদ লে আও—

তারাদাসবাবুর মুখ থেকে কথা সরলো না। তিনি যেন ভূত দেখলেন, যা ভয় করেছিলেন তাই। সত্যবতী পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

তুমি, তুমি—

গম্ভীর মুখে ভারী বালাটা হাত থেকে খুলে সত্যবতী বললো, এটা ওকে দিয়ে তুমি ভেতরে চলে এসো, আর এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না, সত্যবতী মুখ ঘুরিয়ে ভেতরে চলে গেল।

করর্ করর্ করর্ করর্—মাথার মধ্যে শুধু সেই একটানা শব্দ!

শোভনলাল, ওরে শোভন, তোর মাথার মধ্যেও কি এমন পোকা করর্ করর্ করে রে? তুই শুধু, একবার আমার সামনে দাঁড়া আমি তোর দিকে দু'চোখ দিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকি।

বাড়িটা যেন একটু ঘাবড়ে গেছে!

একটু পরেই ঘোড়া ছুটবে। আজ আর তারাদাসবাবুর মার নেই। শোভনের ঘরে গিয়ে তিনি বই দেখে এসেছেন। সাতটা প্লেটের সাতটা ঘোড়া ফার্স্ট হবেই। শোভন ঘোড়াগুলোর নামের তলায় লাল দাগ দিয়ে রেখেছে।

বাড়ি-বন্ধকী টাকা দিয়ে আজ তিনি নতুন বাড়ি তোলার টাকা পকেটে ভরে বাড়ি ফিরবেন। বাহবা শোভন, সাবাস! আগে বলিসনি কেন বাপ!

চারপাশে লোক গিজ গিজ করছে। প্রত্যেকের চোখের তারায় আর সব জায়গায় টাকা ছাড়া যেন তারাদাসবাবু আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। এতো টাকা, আকাশে—মাটিতে টাকার ঝনঝনানি শোনা যাচ্ছে!

তারাদাসবাবু শুধু পকেটে হাত দিচ্ছেন আর বিড়বিড় করে কী বলতে বলতে আপন মনেই হাসছেন। শোভন, শোভন রে!

ট্যাক্সির হর্ণ হুইসেল আর সমস্ত ছাপিয়ে শুধু একটি শব্দ উঠেছে—ঝন ঝন ঝন! আর তারাদাসবাবুর নাকে এসে লাগছে নতুন নোটের গন্ধ—টাকা টাকা টাকা!

রেস আরম্ভ হলো। মাত্র কয়েক মিনিট। প্রথম প্লেট শেষ হলো। আরও

কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় দৌড়ও হয়ে গেল। দেখতে দেখতে সব কটা প্লেট একে একে শেষ হয়ে গেল। ...

...গিন্নী তুমি কোথায়? আমায় ধরো—আমি যে এখুনি পড়ে যাব!... কে নিলে রে? আমার সব টাকা কে ছিনিয়ে নিলে? নিজের চোখে দেখছি ধূলোর বদলে ঘোড়ার খুর থেকে টাকা উড়ছিলো—লেজে ইয়া বড়ো বড়ো থলি বাঁধা ছিল।...শোভন, দে টাকা, সব টাকা আমার।...তোকে আমি খুন করবো আমার টাকা—সব টাকা আমার!

এই বৃদ্ধ জরা-জীর্ণ অট্টালিকা আজ এই চৈত্রের মন্থর শেষ অপরাহ্ণে যেন দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ছে! তা'ও বোধ হয় ছাপিয়ে উঠেছে সত্যবতীর নিঃশ্বাস।

কে জানে কোথায় শোভনলাল! তার এখন উচ্ছল যৌবন—এই বাড়ি তাকে ধরতে পারবে কেন!

আর তারাদাসবাবু?

পয়সা ছড়াতে ছড়াতে কারা যেন শব নিয়ে যাচ্ছে—রাস্তায় অনেক পয়সা। প্রচণ্ড উত্তেজনায় তিনি তাই কুড়োচ্ছেন—পাছে আবার তাঁরও আগে কেউ কুড়িয়ে নেয়, সব সময় সেই ভয়!

রবিবার রাত্রি : ১০ই চৈত্র : ১৩৫২ : কলিকাতা

গণ্ডি

প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠান !

সকাল দশটা থেকে কর্তব্যের প্রবল চাঞ্চল্য আরম্ভ হয়। কর্মের উত্তাল তোড়ে কর্মচারীরা দীর্ঘকালের জন্যে তাদের অস্তিত্ব ভুলে যায়। চারপাশে যন্ত্রের সংগে মানুষের প্রতিযোগিতার সাক্ষ্য মেলে। বোঝা যায় মানুষের কোমল বৃত্তিগুলি দিনে দিনে পিষে যাচ্ছে। একটা উগ্র নির্মম কাঠিন্য মানুষকে প্রাণহীন যন্ত্রে পরিণত করছে।

বোধহয় এরই মধ্যে এই প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠানের পরিচালক রমাপতি কঠিন যন্ত্রে পরিণত হয়েছে! তার চেহারা দেখলেই বোঝা যায় কাজ আর কর্তব্য ছাড়া জীবনে যেন আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। শুষ্ক, নীরস, কঠোর চেহারা। তার চোখ কখনও সজল হয় না, বুকে কখনও আঘাত বাজে না, মনে পড়ে না কোন দাগ—অন্তত তার চেহারা দেখলে সেকথা মনে হয়।

প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠানের অক্লান্ত কর্মী, সুযোগ্য পরিচালক রমাপতি। এ প্রতিষ্ঠান অনেকাংশে তার কাছে ঋণী। কাজ ছাড়া অন্য কোনদিকে মন না দিয়েও মানুষ যে বাঁচতে পারে সেকথা রমাপতি প্রমাণ করেছে।

সে উপদেশ দিয়েছে তার কর্মচারীদের, আজকের পৃথিবীতে কাজ ছাড়া মানুষের আর কিছু করা চ'লবে না। স্বপ্ন দেখার দিন শেষ হ'য়ে গেছে। কাজের চাপে পিষে গুঁড়িয়ে দিতে হবে মনের করুণাকে, হৃদয়ের আবেগকে। সমস্ত শক্তি দিয়ে যন্ত্রকে পরাজিত করতেই হবে। নইলে যন্ত্র ভয়ংকরভাবে মানুষকে গ্রাস ক'রে নেবে। কাজ—কাজ—শুধু কাজ। আর কিছু নয় আজ!

সাড়ে পাঁচটা।

ছুটি হ'য়ে গেছে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে অসংখ কর্মচারী বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু তবু রমাপতি ব্যস্ত হ'য়ে সেই ক'রে যাচ্ছে নিরন্তর।

ছ'টা বাজলো।

আস্তে আস্তে রমাপতি উঠে দাঁড়িয়ে বাইরে চাইলো। শরতের মাঝামাঝি। কিসের মৃদু অলস সূচনা হাওয়া! তার চুল উড়তে লাগলো। সে বেরিয়ে এলো। প্রতিষ্ঠানের বহু বেয়ারা সশ্রদ্ধ অভিবাদন জানালো তাকে। ধীর গম্ভীর পদক্ষেপে রমাপতি মোটরের পাশে এসে দাঁড়ালো।

দেখ যতীন, অকস্মাৎ রমাপতির কী খেয়াল হ'লো, তুমি গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরে যাও—

বিনীত কণ্ঠেস্বরে যতীন বললো, কখন আসতে হবে?

আর আসতে হবে না, আমি হেঁটেই ফিরবো।

ড্রাইভার যতীন অবাক হ'লো। এমন অবিশ্বাস্য কাণ্ড কখনো ঘটেনি। বড়োলোকের কখন কী খেয়াল হয় কে জানে!

যা'হোক মনিবের আদেশে শূন্য গাড়ি নিয়ে যতীন ফিরে গেল। মূল্যবান সাহেবী পোশাক পরা রমাপতি অনভ্যস্ত পদক্ষেপে ট্রাম লাইনের ধারে এসে দাঁড়ালো।

ওর আজ ভারী আশ্চর্য লাগছে—অপরিচিত লাগছে পথের এই জনতাকে। সে যেন সহসা মুক্তি পেয়ে ফিরে এসেছে তাদের কাছে—যাদের ছেড়ে গিয়েছিলো অনেক আগে! গম্ভীর অন্ধকার কারাকক্ষে কে যেন তাকে বন্দী ক'রে রেখেছিলো। শরতের বিচিত্র সজীব স্পর্শ ফিরিয়ে দিলো রমাপতিকে তার ছেড়ে আসা উচ্ছল দিনগুলি! আশ্চর্য মানুষের মন! মুহূর্তে প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠানের কঠোর পরিচালক কেমন যেন বিচলিত হ'য়ে উঠলো।

শরতের হাওয়া দিলো। পরম পরিতৃপ্তির সংগে রমাপতি ফেললো মুক্তির দীর্ঘনিশ্বাস। তারপর হ্যাঁ, আজ বারো বছর পর সে ট্রামে উঠলো। আশ্চর্যের কথা বৈকি!

ট্রামে আরো অনেক লোক। রমাপতি বিস্মিত হ'য়ে তাদের মুখের দিকে চেয়ে রইলো। কতো দিন পর! চারপাশে চেয়ে রমাপতি সমস্ত কিছু ভুলে গেলো। শরতের সজীব স্পর্শ তাকে আবার নিয়ে এলো কৈশোরের তীরে!

রমাপতির মনে পড়লো এমনি শরতে একদিন ট্রামে আরো কয়েকজন

বন্ধুর সংগে কলেজ থেকে বেরিয়ে এসেছিলো। আজ অনেক বছর পর ট্রামে চ'ড়েও রমাপতির ভুল হ'লোনা—হ্যাঁ, এই পথেই তো বন্ধুর বাড়ি—তার নামটা? রমাপতির স্পষ্ট মনে আছে—রাজেন।

আজ সেখানে গেলে কেমন হয়! রাজেন হয় তো খুব বেশি আশ্চর্য হবে। কতো দিন পুরোনো বন্ধুবান্ধবের সংগে দেখা হয়নি! নিজের ওপর রাগ হ'লো রমাপতির!

এক জায়গায় সে নেমে পড়লো। বড়ো রাস্তার ওপরেই রাজেনের বাড়ি। ঠিক তেমনি আছে। রমাপতি সে-বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো।

একি! বিস্মিত হ'য়ে রাজেন ব'লে উঠলো।

রমাপতি হেসে বললো, ঠিক তেমনি আছিস দেখছি!

আমি কি স্বপ্ন দেখছি?

স্বপ্ন নয় সত্য।

বাংলার বিখ্যাত পরিচালক—

থাক্ থাক্, ব'সতে দিবি না নাকি?

কোথায় বসতে দেব তাই ভাবছি—

রমাপতি ততক্ষণে একটা চেয়ারে ব'সে পড়েছে।

কী সৌভাগ্য আমার আজ!

তাড়া দিয়ে রমাপতি বললো, থাম্ থাম্—

অনেক বছর পর দুই বন্ধুর দেখা হ'লো। যাদের ছেলেবেলায় অনেকদিন একত্রে কেটেছে, আজ আবার তারা মুখোমুখি ব'সে গল্প ক'রতে লাগলো। কতো গল্প! যথাসময়ে চা এলো।

দেখা করিস না কেন রাজেন?

তোমার সংগে দেখা করা কি সোজা?

কেন?

কোথায় দেখা করবো?

বাড়িতে, অফিসে—

রাজেন হেসে উঠে বললো, আমরা গরিব, ওসব বড়ো বড়ো জায়গায় মাথা গ'লাবার সাহস আমাদের নেই আর ভাই সত্যি কথাটা কী জানো ?

কী ?

গলা ধাক্কা খাবার ভয় আছে তো।

বাধা দিয়ে রমাপতি বললো, কী যে বলিস !

সত্যি কথা, তোমার কর্মচারিদের চেয়ে আজ আমরা অনেক নিচে, রমাপতি আমার বাড়িতে এসেছে একথা শুনলে লোকে হাসবে, বিশ্বাস ক'রতে চাইবে না।

অবাক হবার ভান ক'রে রমাপতি বললো, তাই নাকি ?

ঠিক তাই, তোমার নাম আজ কে না জানে ? বাংলার বিখ্যাত লোক তুমি !

রমাপতির অন্তরে কোথায় যেন গর্বের সুর বাজলো। রাজেনের কথাগুলি মিথ্যা নয়।

তবু আজ রমাপতি অন্যমানুষ। আজ অকস্মাৎ নতুন পৃথিবীতে সে চ'লে এসেছে। রাজেনকে তার খুবই ভালো লাগছে—খুবই ভালো লাগছে নানারকম আলোচনা করতে। একটা মধুর আলস্যে তার মন ভ'রে গেছে।

রাজেনের বাড়িটিও সুন্দর জায়গায়। শহরের উন্মত্ত কোলাহল কানে আসে না, আর—রমাপতির সহসা মনে হ'লো, টাইপের শব্দও সব সময় মাথা ধরিয়ে দেয় না। এখানে সমস্ত ছেড়ে সে যদি কিছুদিন থাকতে পেতো।

বিশাল আকাশ চোখে পড়ে। কী সুন্দর পৃথিবী ! তার দুঃখ হ'লো এই ভেবে যে কেন সে এতোদিন প্রকৃতির এই সমারোহে সাড়া দেবার জন্যে বেরিয়ে পড়েনি ! দেয়াল-ঘেরা সসীম সংকীর্ণ গণ্ডি তাকে পৃথিবীর সমস্ত কিছু থেকে বঞ্চিত ক'রে রেখেছিলো। সেখানে দিনে দিনে তিল্ তিল্ ক'রে রমাপতি ক্ষ'য়ে যাচ্ছিলো। কিন্তু আজ সে মুক্তির স্বাদ পেয়েছে —পেয়েছে মুক্তির আনন্দ !

রাজেন রমাপতির দিকে চেয়ে বললো, তোমাকে দেখলে আর বাঙালী ব'লে মনেই হয় না।

হুঁ ?

কতোদিন যে ইচ্ছে হ'য়েছে তোমার সংগে দেখা ক'রতে !

করিস নি কেন ?

বললাম তো, গলাধাক্কা খাবার ভয় আছে—

একটু হেসে রমাপতি চুপ ক'রে রইলো।

হ্যাঁ, ভালো কথা, কিছু যদি মনে না করো—

কিছু বলবি ?

হ্যাঁ, মানে—

বল্ বল্, আমার কাছে তোর আবার লজ্জা কি রে ?

আমার ভাইপো'র কথা বলছিলাম—

কী কথা ?

ছেলেটি বড়ো ভালো, বি-এ পাশ ক'রে ব'সে আছে। অনেক জায়গায় চেষ্টা করলাম, চাকরির স্থবিধে হ'লো না কোথাও, তাই বলছিলাম তুমি যদি একটু সাহায্য করো—

নিশ্চয়ই ক'রবো, কোথায় তোর ভাইপো ?

তপেশ এসে দাঁড়াতেই রমাপতি জিজ্ঞেস ক'রলো, তোমার নাম ?

তপেশ রায়।

বি-এ পাশ করেছো ?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

কাল ঠিক বারোটার সময় আমার অফিসে দেখা ক'রো, আমার ওখানেই তোমাকে একটা ভালো চাকরি দিতে চেষ্টা ক'রবো।

তপেশ সশ্রদ্ধ নমস্কার ক'রে চ'লে গেলো।

কর্মের প্রাণময় তরংগ আছাড় খেয়ে প'ড়ছে চারপাশে। রমাপতির মুখে পার্বতিক গাম্ভীর্য। কঠোর কঠিন তার চেহারা। কার্যরত রমাপতিকে দেখলেই বোঝা যায় তার মুহূর্তের অবসর নেই। মনে হয়, সত্যিই সে প্রকাণ্ড প্রতিষ্ঠানের পরিচালক।

তপেশ প্রবেশ ক'রলো।

কী চাই ?

আমি তপেশ রায়।

কী চাও তুমি ?

আপনি আমায় আসতে ব'লেছিলেন আজ—

আমার এখন কথা বলার সময় নেই, কালকের ব্যাপার কাজের চাপে, কর্তব্যের আবহাওয়ায় রমাপতির মন থেকে মুছে গেছে।

আমি রাজেনবাবুর—

ইয়েস, আই নো, এক মুহূর্তের ছেদ পড়লো তারপর রমাপতি বললো, এখানে কিছু সুবিধে হবে না, কাজ খালি নেই এখন—

জানলা দিয়ে শরতের হাওয়া আসছিলো। দরকারী কাগজ-পত্র বোধ হয় উড়ে যাবে—রমাপতি বেয়ারাকে ডেকে জানালাটা বন্ধ ক'রে দিতে বললো।

কলিকাতা

আশ্বিন, ১৩৪৯ঃ

সঙ্

মহাদেব ন্যাশানাল সার্কাসের ক্লাউন্।

তার মুখের গড়ন ঠিক বাংলা পাঁচের মতো। চোখ দু'টো গোল, নাক বেশ লম্বা কিন্তু তীক্ষ্ণ নয়, টিয়াপাখীর ঠোঁটের মতো বাঁকানো। একে দেখবার জন্যেই সহস্র দর্শকের ভিড় জমে যায়।

দু'একটা ছোটখাটো খেলা হ'য়ে যাবার পর নিজের বিশেষ পোশাক প'রে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে অদ্ভুত ভংগীতে মহাদেব এসে আছাড় খেয়ে পড়ে একেবারে মাঝখানে। ব্যাস, সেইটুকুই যথেষ্ট! প্রবল অট্টহাসিতে চারপাশ যেন ফেটে পড়ে।

তারপর রঘুনাথের বাঘের খেলা! কিন্তু প্রথম কয়েক মিনিট রঘুনাথকে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়—দর্শকের হাসি সহজে থামে না।

আরও নানারকম খেলার পর আসে রুক্মিণী।

প্রায় চৌষট্টিটা চেয়ার একটার পর আর একটা দিয়ে উঁচু করা। চেয়ারের তলা দিয়ে সাপের মতো এঁকে বেঁকে রুক্মিণী একেবারে ওপরের চেয়ারে গিয়ে বসে, তারপর তেমনি ক'রে আবার নেমে আসে। কী আশ্চর্য কৌশল! নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হ'য়ে প্রত্যেকে যেন তাদের হৃৎস্পন্দন শোনে! একটু এদিক-ওদিক হ'লেই সর্বনাশ—বে-কায়দায় প'ড়ে গিয়ে রুক্মিণীর হাড় গুঁড়ো হ'য়ে যাবে। হাত-তালির তীব্র শব্দে তাঁবুর বাঁশগুলো যেন দু'লে ওঠে।

তারপর আবার মহাদেব। নিমেষে দর্শকের হৃৎস্পন্দন-শোনার আগ্রহ টুটে যায়—সমস্ত গাম্ভীর্য আর আশংকা হাওয়ায় মিশে যায়।

ঠিক রুক্মিণীর মতো সেও চেয়ারের তলায় সশব্দে মাথা ঠুকে সেই চৌষট্টিটা চেয়ারের সঙ্গে হুড়মুড় ক'রে পড়ে। কিন্তু তার হাড় গুঁড়ো হয় না—অদ্ভুত কায়দায় আঘাত বাঁচিয়ে পা বাঁকাতে বাঁকাতে মহাদেব উঠে দাঁড়ায়।

হাসির আওয়াজ প্রবল হ'য়ে ওঠে।

বাইরে বেরিয়ে এসেই মহাদেব রুক্মিণীকে জিজ্ঞেস করে, কেমন খেলা দেখালাম আজ ?

ওঃ, চমৎকার !

চমৎকার, য়্যাঁ ? হেঁ হেঁ, বা বা বাঃ, খেলা না দেখেই ব'লে দিলে চমৎকার ?

না দেখে মানে ? নিশ্চয়ই দেখেছিলাম।

কই বাবা, মাথা চুলকে মহাদেব বললো, আমি চেয়ারের তলা থেকে চোখ পিট্‌পিট্ ক'রে দেখছিলাম যে, তুমি তো—

তাড়াতাড়ি রুক্মিণী বললো, কেমন ক'রে বেরিয়ে আসো তুমি ? আমি হ'লে তো গুঁড়ো হ'য়ে যেতাম।

আহা হা, কী যে বলো, তুমি হ'লে সার্কাসের প্রাণ—তুমি কি পড়ে যেতে পারো ?

আমি না-হয় সার্কাসের প্রাণ, আর তুমি ?

আমি বাবা সার্কাসের লেজটি।

ওমা, সে আবার কী ?

হুম্ বাবা, লেজটি। কিন্তু পড়ে যাবার কথা তুমি আর ব'লো না—আমার ভয় লাগবে।

আমি প'ড়ে গেলে কাঁদবে তুমি ?

হুম্ বাবা, কেন কাঁদবো না ? তুমি হ'লে সার্কাসের প্রাণটি···সেটি পড়লে কাঁদবো না ? একেবারে ভেউ ভেউ ক'রে—

পেছন থেকে রঘুনাথ ব'লে উঠলো, তোকে ভেউ ভেউ ক'রে কাঁদতে দেখলে সকলে হাসতে হাসতে পেট ফেটে মরে যাবে। ভাগ্ এখান থেকে—

এই সব নিয়ে গড়ে উঠেছে ন্যাশানাল সার্কাস। সমস্ত পৃথিবী থেকে লোক নেয়া হ'য়েছে। আয়োজন বিরাট। তা ছাড়া বাঘ-সিংহ, হাতী ঘোড়া, বাঁদর-ভাল্লুক, নানা রকম জন্তু-জানোয়ার মানুষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খেলা দেখায়।

আজ সার্কাস বন্ধ। মাঝে মাঝে বিশ্রাম। ফেণী মহকুমায় তাঁবু পড়েছে।

বাইরে বেশ জোরে বৃষ্টি পড়ছে, কারুর শহর দেখতে বেরুবার উপায় নেই। চায়ের কাপ, আর খাবারের প্লেট হাতে নিয়ে মহাদেব আর রঘুনাথ রুক্মিণীর তাঁবুতে আসর জমালো।

রুক্মিণী বললো, কিছুই খাচ্ছ না যে রঘুনাথ?

বাড়ির কথা ভাবছি।

বাড়ির কথা? গম্ভীর হ'য়ে রুক্মিণী বললো, বউএর কথা নাকি?

না, আমার বিয়ে হয় নি।

আমারও হয় নি, মহাদেবের কণ্ঠস্বর ভেসে এলো।

আ হা হা হা, হেসে রুক্মিণী বললো, তোমার কেন বিয়ে হয়নি মহাদেব?

কে বিয়ে করবে বাবা? যা হাঙ্গামা! যেন আলুর বস্তা ঘাড়ে নিয়ে কুঁজো হ'য়ে এমনি ক'রে চলা—উঠে দাঁড়িয়ে চলাটা দেখিয়ে দিতে দিতে মহাদেব বেরিয়ে গেল।

হাসতে হাসতে রুক্মিণী বললো, ও এতো শিখলো কোথায় রঘুনাথ?

হ্যাঁ, বেটা শিখছে বটে!

ওর মুখ দেখলেই আমার হাসি পায়। মহাদেব বলে, তার মুখ নাকি আর এক রকম ছিল, চেষ্টা ক'রে ক'রে ও এমনি মজার মুখ তৈরী করেছে।

হবেও বা, শালা সব পারে! তারপর একটু চুপ করে থেকে খুব আস্তে আস্তে রঘুনাথ বললো, আচ্ছা রুক্মিণী, তুমি বিয়ে করো নি?

রুক্মিণী যেন বড়ো বেশি লজ্জা পেল। মাথা নেড়ে জানালো, না।

কেন?

সে অনেক কথা রঘুনাথ!

বল না শুনি?

আর কেউ এদের কথা শুনছে না। বৃষ্টি ঝরার একঘেয়ে শব্দ ভেসে আসছে। মেমসাহেবদের তাঁবু থেকে হাসির কল্লোল শোনা যাচ্ছে। বোধহয় মহাদেব গিয়ে জুটেছে সেখানে।

বলো রুক্মিণী।

আমি বিয়ে করলে সংসার চলবে না। আমার বাবা নেই, মা আর অনেক ভাই বোন। তোমার দেশ কোথায় রঘুনাথ?

দেশের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়েছি অনেকদিন। আমার আপনার লোক

বলতে এখন কেউ নেই। আজ এখানে কাল সেখানে—এখন তো ঘর সংসারের ঠিক নেই। তাই তো বিয়েও করি নি।

তাঁবুর হাওয়া যেন সজল গম্ভীর হ'য়ে উঠলো। কিছুক্ষণ জীবনের নানা কথা ভাবতে ভাবতে দু'জনের বুকে ফুলে ফুলে উঠলো দীর্ঘ নিশ্বাস।

এখানকার প্রত্যেকের জীবনের পেছনে একটা ইতিহাস আছে। এমনি আসরে মাঝে মাঝে সেই সব কথা আলোচনা করা হয়। সকলের ইতিহাস প্রত্যেকের জানা।

জানোয়ারেরা কথা বলতে পারে না। তবু কখনো কখনো খাঁচার ধারে গিয়ে দাঁড়ালে তাদের চোখের ভাষা যেন পড়া যায়। গহন বনের স্বাধীন জীবনের প্রায়-বিস্মৃত ইতিহাস তাদের চোখের তারায় তারায় কাঁপে। তাদেরও দীর্ঘনিশ্বাস খাঁচার কোটরে জমা হ'য়ে আছে।

কিন্তু শুধু ব্যতিক্রম মহাদেব। তার চেহারা দেখলেই প্রত্যেকের হাসি পায়। তারও নিশ্চয়ই একটা কাহিনী আছে আর হয়তো তা একান্ত দুঃখেরই গম্ভীর ইতিহাস! কিন্তু সে কথা শুনবে কে? তার মুখই যে দুঃখ ভোলানো। ভাঁড়ামির প্রবল চাপে মহাদেবের অন্তরের গভীর দিকটা আজ একেবারে গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে গেছে। মহাদেবও নিজের সব গভীর কথা ভুলেছে—এই ভাঁড়ামির ভোলই তার একমাত্র চরম পরিচয়।

যদি সে একদিন অন্য সকলের মতো খুব গম্ভীর মুখে আসরে বলতে আরম্ভ করে. শোন তোমরা, তোমাদের মতো আমিও একদিন সংসারে ছিলাম, আমারও আশা ছিল, স্বপ্ন ছিল, বিয়েও করবো ভেবেছিলাম—কিন্তু এতো কথা ওই মজার মুখ নিয়ে বলতে পারবে কি? আর বললেই বা লোকে শুনবে কেন! মহাদেবের জীবনের গভীর কাহিনী তার ভাঁড়ামির ছাপমারা মুখের চেয়ে বড়ো কি? লোকে হাসি ঠেকাবে কেমন করে!

মহাদেবের কোন কথাই কেউ জানে না।

সকালবেলা জন্তু জানোয়ারদের খেলা শেখানো হয়। রঘুনাথই শেখায় আর অনেকে নিজের খেলা অভ্যাস করে নেয়। মহাদেব এ সময়টা বড়ো ব্যস্ত থাকে। কারণ তাকে হাসাবার নতুন ভংগী বের করতে হয় আর খেলারও অভ্যাস করে নিতে হয় মাঝে মাঝে।

রুক্মিণী দূরে দাঁড়িয়ে মহড়া দেখে। কখনও কখনও সে মুগ্ধ বিস্ময়ে

রঘুনাথের দিকে পলকহীন চোখে চেয়ে থাকে। তার দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, গায়ের রঙ আর গম্ভীর মুখ রুক্মিণীর মনে যেন নেশা জাগায়। রঘুনাথ কি যাদু জানে? তাকে দেখলেই বাঘ সিংহেরা যেন স্তিমিত হয়ে পড়ে। চেয়ে চেয়ে রুক্মিণীর মানসিক বিলাস বেড়ে যায়। তারপর সে হাসতে আরম্ভ করে। দূর থেকেই হাসির শব্দ শুনে মহাদেব বুঝতে পারে রুক্মিণী তাকে লক্ষ্য করছে। হঠাৎ মহাদেবেরও উৎসাহ বেড়ে যায়। গড়াতে গড়াতে সে চলে আসে একেবারে তার পায়ের কাছে।

কেমন রুক্মিণী?

খুব ভালো, এতো জানো তুমি!

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে:কথা নেই বার্তা নেই মহাদেব ফস্ করে গান ধরে, আমি জানি তাই মানি···

মহাদেবের হাত ধরে টানতে টানতে রুক্মিণী তাঁবুতে চলে এলো।

কী খাবে বলো মহাদেব?

তোমাকে খাবো—হাঁ—মহাদেব মুখটা একটু বেঁকিয়ে গোল হাঁ করলো।

বাবারে বাবা, এতো হাসাতে পারো তুমি, পেটে খিল ধরে গেল!

ছেড়ে গেলেই সেরে যাবে।

তাই নাকি?

হুম্ বাবা।

সত্যি মহাদেব, তোমাকে দেখলে শুধু হাসতে ইচ্ছে করে। কাকে বিয়ে করবে তুমি? সে বোধহয় হাসতে হাসতে মরে যাবে।

নকল কান্নাভরা গলা ক'রে মহাদেব বললো শুধু আমার এই চেহারাটা দেখে প্রথমেই ডুকরে কেঁদে উঠবে—হুম্ বাব্বা!

হেসে ফেলে রুক্মিণী বললো, বলো এবার কী খাবে?

বকের ডিম—

বকের ডিম? সে কোথায় পাবে?

ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডিম্ ডিডিডিম্ ডিডিডিম্—নাচতে নাচতে মহাদেব বেরিয়ে গেল।

সেদিন একেবারে প্রথমেই এক কাণ্ড !

ঘোড়ার পিঠের ওপর পি-কক্ হ'তে গিয়ে মাটিতে পড়লো মহাদেবের মাথার চাঁদি। একটা শব্দ হ'লো। মহাদেব জ্ঞান হারালো—রক্তের ধারা ব'য়ে গেল। ধরাধরি করে মহাদেবকে ভেতরে নিয়ে যাওয়া হ'লো। তারপর ডাক্তার—ব্যাণ্ডেজ ইত্যাদি।

এমন ঘটনা এই সার্কাসে এই প্রথম। আজ মহাদেব দেখছিলো দূরে দাঁড়িয়ে রুক্মিণী হাসছে—তাকে দেখে এক মুহূর্তের জন্যে সে কী যেন ভেবেছিল! ব্যস্ তারপরই এই কাণ্ড! কিছুক্ষণের জন্যে খেই হারিয়ে গেল। সার্কাসের লোকেরা কি করবে ভেবে পেল না।

জ্ঞান হবার পর চোখ খুলে মহাদেব বুঝতে পারলো না সে কোথায়। চোখ চেয়ে দেখলো রুক্মিণী গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে আর তার মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।

কেমন আছো মহাদেব ?

আমার কী হ'য়েছে ? স্বপ্নের মতো সমস্ত ঘটনাটা মহাদেবের মনে পড়লো।

মৃদুস্বরে রুক্মিণী বললো, আর কথা ব'লো না, ঘুমোও চুপ ক'রে—

আমার মাথায় বড়ো যন্ত্রণা—উঃ, বড়ো কষ্ট—

সব সেরে যাবে মহাদেব। ঘুমোও, তোমার কপালে আমি হাত বুলিয়ে দিই।

তুমি থাকবে, আমি বাঁচবো রুক্মিণী ?

আঃ, কী যে বলো !

কেন আমার এমন হ'লো !

কিছু হয়নি তোমার। আর কথা ব'লো না, ব্যথা তাহ'লে বেড়ে যাবে।

হ্যাঁ হ্যাঁ এবার আমি ঘুমোই।

দূরে কোলাহল শোনা যাচ্ছে। বোধ হয় সকলের খাওয়া শেষ হ'লো। রাত কত কে জানে !

কয়েক দিন কাটলো।

আজ ডাক্তার বাবু আশা দিয়ে গেছেন, মহাদেবের আর কোন ভয় নেই।

রুক্মিণীর দিকে চেয়ে চেয়ে কৃতজ্ঞতায় মহাদেবের মন ভ'রে গেল।

বার্লিটা খাও এবার—

না, আমাকে আর বার্লি দিও না।

ছি, ছেলেমানুষী করে না, আমার কথা শোন!

আগে তুমি খাও?

ওমা, আমি কেন খেতে যাব? আমার কি হ'য়েছে?

তাহ'লে আমিও খাবো না।

বারে, এতো বেশ!

নিঃশব্দে অন্ধকার জমা হচ্ছিল। রুক্মিণী আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে ল্যাম্প্ জেলে দিল। আর সেই মৃদু আলোয় তার চেহারা দেখে মহাদেবের কি যেন মনে হ'লো—একটা তীব্র নতুন অনুভূতিতে তার শরীর কেঁপে উঠলো। বার্লি হাতে নিয়ে মহাদেবের বিছানায় আবার এলো রুক্মিণী আর আস্তে আস্তে মহাদেব তার একটা হাত চেপে ধরলো।

বার্লি খাও—

রুক্মিণী, কেন তুমি আমার জন্যে এত কর, কথাটা মৃদু গম্ভীর স্বরে বললো মহাদেব আর তার মুখে একটা অদ্ভুত ভাব ফুটে উঠলো।

হঠাৎ হাসির প্রবল তরঙ্গ উঠলো রুক্মিণীর পেটে। সে অনেক চাপতে চেষ্টা করলো কিন্তু ফল হ'লো না কিছুই। হাসির তোড়ে কিছুটা বার্লি ছিটকে পড়লো মহাদেবের গায়ে।

এ কি, অতো হাসছো কেন রুক্মিণী?

না, কিছু না—

আবার আমার মুখ দেখে তোমার হাসি পাচ্ছে, না?

না না—বার্লির কাপটা রেখে হাসি থামাবার জন্যে রুক্মিণী বাইরে বেরিয়ে গেল। একটু পরে ফিরে এসে দেখলো মহাদেব বার্লি খায়নি, কাপটা দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে।

রাগ হ'য়েছে, না?

না।

ও বাবা বড্ড রেগে গেছ দেখছি।

না, আমার আবার রাগ কি!

হাসি চেপে রুক্মিণী বললো, ছি, অত রাগ করে না, এখনো তুমি খুব দুর্বল —আবার অসুখ বেড়ে যাবে যে!

আমি মরলেই বা কার কি!

থাক, অনেক হ'য়েছে, যাই আবার আমার কাজ বাড়লো, বার্লি করি গে!

আমি খাবো না।

দেখা যাক, হাসতে হাসতে রুক্মিণী চলে গেল।

বার্লি তৈরী ক'রে ফিরে এসে দেখলো মহাদেব ঘুমিয়ে পড়েছে।

রুক্মিণী তাকে আর জাগালো না। তার অদ্ভুত মুখের দিকে চেয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো।

কয়েক দিন পর মহাদেবের মনে হ'লো তার ব্যথা অনেক কমে গেছে। বোধহয় ইচ্ছে করলে সে এখন উঠে দাঁড়াতে পারে। সে উঠতে যাবে এমন সময় রুক্মিণী এলো।

উঠো না, উঠো না বলছি।

আমি সেরে গেছি রুক্মিণী।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কে সারিয়ে তুললো তোমাকে?

তুমি। কিন্তু কেন আমাকে সারিয়ে তুললে তুমি?

কেন বল তো?

আমাকে দেখে হাসবে ব'লে।

না না মহাদেব।

সত্যি বলছো?

হ্যাঁ গো, মহাদেবের পাশে রুক্মিণী ব'সে পড়লো।

তার একটা হাত ধরে মহাদেব বললো, একটা কথা বলবো রুক্মিণী?

বলবে বৈ কি, নিশ্চয়ই বলবে।

ভাবছি আমার অসুখ কেন সারলো? তোমাকে তো আর অতো বেশি কাছে পাবো না।

হেসে ফেলে রুক্মিণী বললো, এত কথা শিখলে কোথায়?

তুমিই তো শিখিয়ে দিলে, একটু থেমে মহাদেব আবার বললো, আচ্ছা রুক্মিণী, তোমার কী কোনদিনও বিয়ে হবে না ?

কে বিয়ে করবে আমায় ?

প্রচুর উৎসাহ নিয়ে মহাদেব জোরে ব'লে উঠলো, আমি—আমি তোমাকে বিয়ে করবো রুক্মিণী !

আরও জোরে হেসে উঠে রুক্মিণী বললো, দূর পাগলা, তোমাকে কেন বিয়ে করবো ? রঘুনাথ—রঘু কী আমায় বিয়ে করবে !

বড়ো বেশি আঘাত লাগলো মহাদেবের, করুণ চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে রুক্মিণীর মুখের দিকে সে চেয়ে রইলো।

হাসতে হাসতে রুক্মিণী বললো, বিয়ে—তোমাকে বিয়ে—বাকি কথাগুলো হাসির ঝাপটায় সে আর বলতে পারলো না।

শীতের প্রবাহে তাঁবুর চারপাশ গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে।

আজ রাত্রে হবে শেষ প্রদর্শনী। বহুদিন পর আসরে আবার মহাদেবকে দেখা যাবে। হ্যাণ্ডবিলে একথা লেখা ছিল। সন্ধ্যে থেকেই শহরের সমস্ত লোক ভেঙে পড়লো সার্কাসের তাঁবুতে। ভেতরে প্রত্যেক খেলোয়াড় প্রস্তুত—যাবার আগে সব চেয়ে ভালো খেলা তারা দেখিয়ে যাবে।

যথা সময়ে সার্কাসের সেই পরিচিত বাজনা বেজে উঠলো। রুক্মিণীকে আজ লাল পোশাকে দেখাচ্ছে উজ্জ্বল তলোয়ারের মতো। দূরে দাঁড়িয়ে মহাদেব তার খেলা দেখলো। সেই রুক্মিণী—যে তার মাথার কাছে বসে থাকতো দিনের পর দিন আর রাতের পর রাত।

তারপর আরম্ভ হ'লো রঘুনাথের বাঘের খেলা। চাপা উত্তেজনায় গ্যালারীগুলো যেন থম্ থম্ করছে। চারপাশে চারটে রয়েল বেঙ্গল টাইগার নিয়ে শুধু হাতে তেজস্বী নির্ভিক বীরের মতো রঘুনাথ ভয়াবহ খেলা দেখাচ্ছে। কখনও বাঘের মুখে মাথা পুরে দিচ্ছে আর কখনও অদ্ভুত কৌশলে প্রকাণ্ড বাঘকে ধরাশায়ী করছে। জনতার মুখে ফুটে উঠেছে তীব্র আগ্রহ।

দর্শকদের আড়ালে একটু দূরে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে মহাদেব আর রুক্মিণী

খেলা দেখছে। মহাদেব এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে রুক্মিণীর মুখের দিকে। কী ব্যাকুল দৃষ্টি রুক্মিণীর! তার গভীর কালো চোখ থেকে যেন আগ্রহ আর উত্তেজনার জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

মহাদেব ভাবলো, তার খেলার সময় রুক্মিণীর চোখ মুখ এমনি অপরূপ হয়ে ওঠে না কেন! সে শুধু হাসে। কিন্তু সে তো তার মনে এমনি দাগ অতি সহজে কাটতে পারতো! কি খেলা দেখায় রঘুনাথ! অমন খেলা ইচ্ছে করলেই মহাদেব দেখাতে পারে। হোক না সে এ সার্কাসের ভাঁড়, কোন খেলা সে না জানে? হ্যাঁ, এই বাঘের খেলা এক সেকেণ্ডে সে দেখাতে পারে। মহাদেবের মাথার ভেতর কেমন যেন হতে লাগলো। দুর্বল শরীর নিয়ে সে এগিয়ে যেতে লাগলো।

হঠাৎ প্রচণ্ড হাসির শব্দে মহাদেবের চমক ভাঙলো। আরে একি সে যে একেবারে রঘুনাথের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে দেখে আর দর্শকদের হাসির আওয়াজে বাঘগুলোও বেশ বিচলিত হয়ে পড়েছে।

কোন রকমে হাসি চেপে রঘুনাথ মহাদেবের কাছে এগিয়ে এসে কানে কানে বললো, এই শালা পালা এখান থেকে, বাঘ ক্ষেপে গেলে মুশকিল হবে।

পরিপূর্ণ সার্কাস মণ্ডপে দাঁড়িয়ে অকস্মাৎ মহাদেব যেন নিজেকে ফিরে পেল, ফ্যাল ফ্যাল করে দর্শকের দিকে চাইলো সে শুধু একবার। তারপর তার নিজস্ব ভংগী করে পা বাঁকাতে বাঁকাতে বেরিয়ে গেল। চারপাশে হাসির প্রচণ্ড আওয়াজ। দূরে রুক্মিণীও হাসছে।

কলিকাতা
আশ্বিন : ১৩৫২ :

দূরদ্রষ্টা

তারিণীকে স্বীকার করে না শুধু একজন—তার মেয়ে সরযূ।

জ্যোতিষী তারিণী বাচস্পতির নাম আজ কে না জানে! সকাল থেকে সন্ধ্যে অবধি তার বাড়িতে ভিড় লেগে থাকে। মাঝে মাঝে অনেক মোটর গাড়িও দাঁড়াতে দেখা যায়। লোকের বিপদে আপদে তারা সর্বপ্রথম ছুটে আসে এখানে—হাত মেলে দেয় তার সামনে আর তারিণী যখন তাদের অদূর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সন্ধান দেয় তখন সরযূ হাসে। মাঝে মাঝে তার হাসি এত জোরে হয় যে পাশের ঘরে তারিণী শঙ্কিত হয়ে ওঠে—তার তাল কেটে যায়, একটা চাপা আক্রোশে চোথ মুখ লাল হয়ে ওঠে, শিরাগুলো ফুলে যায়।

এই রকম একটা ব্যাপারে একদিন তারিণীর আর ধৈর্য রইলো না। একটি চমৎকার হাত দেখতে দেখতে চেপে চেপে তারিণী বলছিল, সব ভালো আপনার, সুখ-শান্তি, টাকা-পয়সা, কিছুরই অভাব থাকবে না, তবে হ্যাঁ, মামলা-মোকদ্দমা আপনাকে ছাড়বে না। অনেকবার আদালতে ছুটো-ছুটি করতে হবে—এমন সময় শোনা গেল সরযূর খিল্‌খিল্ হাসি। সেই চমৎকার হাতওলা লোকটিকে তারিণী বললো একটু বসুন তো—তারপর রাগে কাঁপতে কাঁপতে দুম্‌দুম্ ক'রে সটান ভেতরে চলে এলো।

তুই ভেবেছিস কি সরযূ, তোকে আমি খুন করে ফেলবো।

বারে, আমি কী করলাম?

আমি কী করলাম? মুখ ভেঙিয়ে তারিণী বললো, ফের্ অমন যখন-তখন হি-হি করে হাসলে মুখ ভেঙে দেব একেবারে।

বাঃ, হাসি পেলে হাসবো না?

কেন, হাসবি কেন শুনি?

তুমি হাত দেখে লোককে অত বাজে কথা বললেই আমার হাসি পায়।

ওসব বাজে কথা নয়!

বাজে কথাই তো, মানুষের ভবিষ্যৎ কেউ বলতে পারে নাকি? তুমি তো আর ভগবান নও।

যত বড়ো মুখ নয় তত বড়ো কথা, লোকে আমার কাছে আসে দু'টো মিথ্যে কথা শুনতে, না?

অনেক মানুষ অমনি· বোকা থাকে, সরযূ কোমরে কাপড় জড়িয়ে বললো, তাদের যা বলবে তাই বিশ্বাস করবে। কই বল দেখি আমার হাত দেখে আমার কবে কী হবে? ছাই পারবে বলতে—বাপের উত্তর শোনবার আগেই সরযূ সেখান থেকে পালিয়ে গেল। আর তারিণী দাঁতে দাঁত চেপে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ—রাগে তার শরীর কাঁপছে।

কালীঘাটের কাছে ছোট একটি বাড়ি। বাইরে বিরাট সাইনবোর্ড—ভাগ্য গণনা! ভাগ্য গণনা! ভাগ্য গণনা! এই যে, সুবিখ্যাত জ্যোতিষী তারিণী বাচস্পতি!

বাড়িতে সবসুদ্ধ আড়াইখানি ছোট ছোট ঘর। আলো-বাতাস আসে না—দরকারও নেই। ভাড়া ষোল টাকা। বাইরের ঘরটা তারিণীর। একটা খাট, একটা পায়া-ভাঙা চেয়ার, একটা ছোট টেবিল, কয়েকটা মা কালীর ছবি আর খানকয়েক জ্যোতিষের বাঙলা বই—এইতেই ঘর ভরে গেছে। হুঁকো হাতে নিয়ে প্রায় সমস্তক্ষণ তারিণী বসে থাকে সে-ঘরে। সরযূর সঙ্গে তার সম্বন্ধ নেই বললেই চলে। শুধু খাবার সময় তাদের মধ্যে দু'একটা প্রয়োজনীয় কথা হয়। মেয়েটার ওপর একটা চাপা বিদ্বেষ তারিণীর দিন দিন বেড়ে উঠছে। সরযূ বড় পাকাপাকা কথা শিখেছে আজকাল। কোথা থেকে শিখলো এত জ্যাঠামি? ব্যঙ্গ যে তারিণীকে সহ্য করতে না হয়েছে তা' নয়। কিন্তু নিজের মেয়ের কাছ থেকে—তার শিরাগুলো দপ্ দপ্ করে।

সেইসব দিন তারিণীর আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। প্রথম এ পাড়ায় এসে যখন সে বিরাট সাইনবোর্ড টাঙালো তখন ভিড় জমে গিয়েছিল বাড়ির সামনে। তারপর রাস্তায় বার হলেই ছড়া কাটতে কাটতে পাড়ার ছেলেরা পেছনে পেছনে আসতো। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে যেত তারিণীর। কিন্তু যারা একদিন ব্যঙ্গ করতো, আজ ভিড়ের জন্যে তারিণীর বাড়িতে এসে বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় তাদের—অনেককে সে ব্যর্থও করে।

মনে মনে তারিণীর দৃঢ় বিশ্বাস সরযূকে একদিন হার মানতেই হবে—ভিড় ঠেলে হাত বাড়াবার জন্যে তাকেও ঠেলাঠেলি করতে হবে—আর তখন সে দেখে নেবে তার মেয়েকে।

আজ থেকে কয়েক বছর আগে যখন তারিণীর স্ত্রী মারা যায়, তখন তার মনে হয়েছিল সে এক কাণ্ড করেছে। তার স্ত্রী কামিনীর কলেরা হয়েছিল। হঠাৎ এক সময় চোখের জল মুছতে মুছতে তারিণী সরযূকে বলেছিল, আর কবিরাজ দেখিয়ে লাভ নেই মা।

শুকনো গলায় সরযূ বলে উঠেছিল, কেন বাবা, কবরেজ মশাই কিছু ব'লে গেছেন?

প্রচ্ছন্ন গর্বের চাপা হাসি হেসে তারিণী উত্তর দিয়েছিল, কবিরাজ আর কি বলবে মা, গণনা করে আমিই দেখেছি ওর আয়ু আর মোটে তিন দিন—

কি বল বাবা যা তা, সরযূ কঠিন গলায় বলেছিল, তোমার কি একটু লজ্জাও করে না মার সম্বন্ধে অমন কথা বলতে?

সত্যি কথা বলতে আবার লজ্জা কি?

থাক বাবা, চোখে জল নিয়ে সরযূ বলেছিল, ওসব বাজে কথা শোনার তো অনেক লোক আছে, মার সম্বন্ধে আর নাই-বা বললে!

থাম, থাম, তারিণী চিৎকার করে উঠেছিল, আমার মুখের ওপর ফের্ কথা বললে তোকে—কথা শেষ করতে গিয়ে তারিণী দেখলো সরযূ সে-ঘরে নেই।

ঠিক তিন দিনের দিন কামিনী সত্যিই মারা গেল। স্থানকাল ভুলে সরযূর একেবারে সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে তারিণী বললো, যা বলেছিলাম তা হ'লো কি না?

সরযূ একটি কথাও বলেনি! শুধু কটমট্ করে বাপের দিকে চেয়েছিল। আর কামিনীর মৃত্যুর পর বাপ আর মেয়ের সম্বন্ধটা আরও অদ্ভুত হয়ে দাঁড়ালো।

সরযূ আজকাল স্পষ্টই বুঝতে পারে তারিণীর জ্বালা কোথায়—সে মনে মনে হাসে। আর তারিণীর সব সময় মনে হয় মেয়ে তাকে ব্যঙ্গ করবার জন্যে বসে আছে। ফলে সরযূ তাকে যাই জিজ্ঞেস করুক না কেন, তারিণী মনে করে সে তাকে আঘাত করছে—সামান্য কথাতেই ঝগড়া বেধে যায়।

একদিন হয়তো সরযূ জিজ্ঞেস করলো, আজ ক'জন এসেছিল সবশুদ্ধ?

তোর কি দরকার শুনি ?

নাঃ, এমনি !

সবতাতে মাথা গলানো কেন ? হ্যাঁ আসে, রোজই আমার কাছে লোক আসে। পাঁজি খুলে হাঁ করে যারা বসে থাকে আমি সে-জাতের গণক নই বুঝেছিস ?

মুচকি হেসে সরযূ বললো, হ্যাঁ, কিন্তু তুমি চটে যাচ্ছ কেন বাবা ?

না চটবে না ? ওর পাকাপাকা কথা শুনে ফ্যা ফ্যা করে হাসবে—যা যা, আমার সঙ্গে কথা বলতে আসিস কেন তুই ?

বেশ, কথা বলবো না আর !

হ্যাঁ, সেই ভালো !

তারপর সত্যিই কিছুদিনের জন্যে বাপ আর মেয়ের কথা বন্ধ হয়ে গেল। খাবার সময় পাশে বসে বাতাস করতে করতে সরযূ বলে, কারুর কিছু দরকার হলে যেন চেয়ে নেয়।

থাক্ থাক্, কাউকে আর দালালি করতে হবে না।

দালালি আবার কে করলো ?

হুঁ, তাড়াতাড়ি কোন রকমে খাওয়া শেষ করে তারিণী চলে যায়।

হঠাৎ একদিন বাপ আর মেয়ের ভাব হয়ে গেল আবার। এক গাল হেসে তারিণী বললো, জানিস সরযূ, জজ্ সাহেব এসেছিল আজ হাত দেখাতে—খুব বড়োলোক, মস্ত গাড়ি করে এসেছিল। হর্ণের আওয়াজ শুনেছিলি তো ? বেশ ভালো করে হাত দেখে দিলাম।

তাই নাকি ? হেসে সরযূ বললো, কী বললে তুমি ?

হাসির অর্থটা তারিণী ঠিক বুঝতে পারলো না। উৎসাহের সঙ্গে ব'লে গেল, বললাম ভয়ের কোন কারণ নেই সাহেব, আপনার স্ত্রী ঠিক সেরে উঠবেন। আরও বলেছি—কিন্তু সে সব কী আর মনে থাকে রে ?

তাতো ঠিকই, কত কী বলেছ !

হ্যাঁ হ্যাঁ, কড়া নাড়ার শব্দ শুনে তারিণী চ'লে গেল।

সরযূ স্পষ্ট বুঝতে পারে মাঝে মাঝে তারিণী কী অসীম আগ্রহ নিয়ে তার কাছে নিজের প্রতিষ্ঠা প্রচার করার চেষ্টা করে। সরযূর মায়া হয়—কখনও কখনও এইজন্যে সে তারিণীকে সমর্থনও করে।

একদিন অনেক খাবার আর ফলমূল নিয়ে তারিণী ভেতরে এলো, নে রে সরযূ, এগুলো তুলে রাখ—

একি, এত সব কোথা থেকে এলো? অবাক হ'য়ে সরযূ জিজ্ঞেস করলো। সেই জজ সাহেব, হাসতে হাসতে তারিণী বললো, আমার কথা তো ভুল হবার নয় রে! তাঁর স্ত্রী সেরে উঠেছেন—তাই খুশী হ'য়ে সাহেব ভেট দিয়ে গেলেন।

তাই নাকি? বাঃ, বেশ তো!

হুঁ হুঁ বাবা, বলি না তোকে? বাজে কথা ব'লে ভালো জ্যোতিষী হওয়া যায় না রে, ফাঁকি একদিন ধরা পড়েই। এই ফাঁকিবাজদের জন্যেই তো অনেক ভালো লোককে লোকে বিশ্বাস করতে চায় না। কিন্তু আমাদের কাছেই বা এত লোক আসে কেন? খাঁটি জিনিস চাপা থাকে না রে। তাই তো তোকে বলি, অত অশ্রদ্ধা করিস না জ্যোতিষ শাস্ত্রকে।

না বাবা, আমি তো অশ্রদ্ধা করি না—তবে কী জানো? ওসব বাজে কথা আমার ঠিক বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না—

বাজে কথা? আবার সেই পাকামি—বিকৃত মুখে তারিণী ঘর ছেড়ে চলে গেল।

যখন ঘরে কোন লোক থাকে না, দুপুরে শুয়ে শুয়ে তারিণী এপাশ ওপাশ করে তখন হঠাৎ তার মনে পড়ে যায় সরযূর কথা। তার সমস্ত মনকে এ চিন্তা যেন দংশন করে—মনে হয় সে যেন এই মাত্র অসহ্য পরিশ্রম ক'রে এলো। কিন্তু তাকে সরযূ বিশ্বাসই বা করে না কেন? এখন তার এত যশ, এত প্রতিষ্ঠা বাইরের লোকের কাছে—তবু সরযূর এই অবিশ্বাস কেন? কেন সে স্বীকার করে না তারিণীর সত্য শাস্ত্রকে? রাগে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে তারিণী। কিন্তু আবার এক সময় সে ভাবে, সে-ই বা সরযূকে অত প্রাধান্য দেয় কেন? কী এসে যায় ওই রকম একটা পুচকে মেয়ের মতামতে? কে মানে তার কথা? কে গ্রাহ্য ক'রে তাকে? এই তো, বাইরের কত লোক তাকে শ্রদ্ধা করে—তাকে স্বীকার করে—তবে? তবু কোথায় যেন সরযূর প্রতি তার একটা ব্যাপক দুর্বলতা থেকে যায়।

দেখ্‌ সরযূ, এক সময় তারিণী বললো, গণনা ক'রে দেখলাম, আর এক হপ্তার মধ্যে তোর অসুখ হবে বুঝলি?

হুঁ? হেসে ফেলে সরযূ বললো, কখ্‌খনো হবে না।

দেখ্ তুই, বেশ গম্ভীর হ'য়ে তারিণী বললো, আজ সোমবার আমি তোকে বললাম, আগামী সোমবারের মধ্যে তুই দেখে নিস্—

বেশ তো দেখাই যাক না, কিন্তু আমার কিচ্ছু হবে না তুমি দেখে নিও বাবা।

থাম্ থাম্, সরযূকে তাড়া দিয়ে তারিণী বেরিয়ে গেল।

সাত দিনের মধ্যে যখন পাঁচ দিন কেটে গেল অথচ সরযূর অসুস্থতার কোন লক্ষণ দেখা গেল না, তখন তারিণী মনে মনে সত্যিই চিন্তিত হ'য়ে উঠলো। যদি সরযূর কিছু না হয়, তাহ'লে মেয়ের কাছে তার মুখ থাকবে কেমন করে! তারিণী বিচলিত হয়ে পড়লো।

শীতকাল। চারপাশ থম্ থম্ করছে। সন্ধ্যেবেলা কালীঘাটের সেই ছোট বাড়িটাকে মনে হচ্ছে যেন ধোঁয়ার রাজ্য। মাঝে মাঝে দম বন্ধ হ'য়ে আসে। ট্রাম-বাসের একঘেয়ে শব্দ আর যাত্রীদের কোলাহল তবু কিছু বৈচিত্র্য আনে।

তারিণী বললো, সরযূ, যা মা চান করে আয়—মাথাটাও ধুয়ে ফেলবি বেশ করে।

তারিণীর কণ্ঠস্বর অনেকদিন পর হঠাৎ অত্যন্ত মিষ্টি মনে হলো সরযূর। তবু অবাক হয়ে সে বললো, চান করে আসবো? কী বলছ বাবা? এই শীতে ঠাণ্ডা জল মাথায় দিলে অসুখ করবে যে—

না না, তুই চানটা করে নে, বড় শুকনো দেখাচ্ছে তোকে আর মাথাটাও অমনি বেশ করে ধুয়ে ফেলিস।

কিন্তু বাবা—

না না না, আর কিন্তু-টিন্তু নয়, বড়ো শুকনো আর বিশ্রী দেখাচ্ছে তোকে—চেহারাটা বড়ো খারাপ মনে হচ্ছে তোর—

ম্লান হেসে সরযূ বললো, চেহারা তো আমার অনেকদিন থেকেই খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মা নেই কে আর দেখবে? তুমি তো আর—

কী যে বলিস মা! হ্যাঁ, যা যা আর দেরি নয়, চানটা ক'রে আয়।

কিন্তু তারিণীর ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হলো। সন্ধ্যেবেলা কন্‌কনে ঠাণ্ডা জলে মাথা ভিজিয়ে অনভ্যস্ত সরযূ চান করলো। অসুখ তার হ'লো না। সাত দিন কেটে গেল।

কই বাবা, আজ তো সোমবার, আমার অসুখ—

অমন হয়—মাঝে মাঝে একটু এদিক-ওদিক—

সাধে কি আর বলি? সরযূ হাসলো।

ফের্ ছোটমুখে বড়ো কথা!

ঠিক কথাই বলছি তো!

এই ভয় তারিণী করছিল। সে জানতো মেয়ে তাকে ছেড়ে কথা বলবে না। আর মনে মনে যথেষ্ট শঙ্কিত হ'য়েই সে দিন কাটাচ্ছিল।

তবু চিৎকার ক'রে তারিণী বললো, যা যা, অলক্ষ্মী তুই তাই দেব-দেবী শাস্ত্র তোকে ছোঁয় না—তোর মা ছিলেন সতী-লক্ষ্মী তাই তার বেলা আমার কথাটা ফলে গেল আর তুই—

কেন মার কথা তুলছো বাবা? তার বেলা আবার ভবিষ্যদ্বাণী কী সে তো জানা কথাই, কলেরায় কে বাঁচে?

তিন দিনের মধ্যে—সে কথাও বলেছিলাম না?

অমন দু'একটা আন্দাজ লেগে যায়, সরযূ মনে মনে একটু রেগেছিল আজ, তাই কঠিন গলায় বললো, কিন্তু মার কথা তুমি আর তুলো না বাবা, ওতে বাহাদুরী করবার কিছু নেই।

কিছু নেই না? আন্দাজে বলেছিলাম? তোকে আমি—তুই আমার শনি, তোকে বিদেয় করতে না পারলে আমার শান্তি নেই—তারিণীর চোখ দু'টো যেন জ্বলছিল।

যেমন ক'রে হোক যত শিগ্‌গির পারা যায় সরযূর বিয়ে না দিলে তারিণীর নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। ওকে সামনে দেখলে একটা চাপা অতৃপ্তি তার দেহমন আচ্ছন্ন করে দেয় বিয়ে দিতে পারলে তবু এই জ্বালাময় অতৃপ্তি দূর হবে। সে বাইরের ঘরে ব'সে হুঁকো হাতে নিয়ে সরযূর বিয়ের কথা ভাবতে লাগলো। আর দেরি নয়, তারিণীকে তাড়াতাড়ি শান্তি পেতেই হবে।

ফাল্গুনের প্রথম দিকেই তারিণীর যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। তার সমস্ত মনের ওপর দিয়ে তৃপ্তির তরঙ্গ ব'য়ে গেল যেন। পাত্রের নাম সদাশিব ভট্টাচার্য। তার আর কেউ নেই। কাজেই কোন বাধা, আপত্তি হলো না—একে একে সমস্তই চুকে গেল।

আজ তারিণী নিশ্চিন্ত। তবু মাঝে মাঝে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। কী যেন ছিল—কে যেন আজ নেই আর কেমন একটা অলস আমেজ চারপাশ থেকে তাকে ঘিরে ধরে। যাবার সময় খুব কাঁদছিল সরযূ। তার অমন কান্না তারিণী আর কখনও দেখে নি।

সরযূ সংসারের সমস্ত ভার তাকে বুঝিয়ে দিয়ে গেছে। পাছে তারিণীর অসুবিধা হয় তাই কোথা থেকে একটা বিশ্বাসী ঝি-ও ঠিক ক'রে গেছে। কিন্তু তবু তারিণীর বড়ো খারাপ লাগে। এ যেন আর এক নতুন অতৃপ্তি।

দিন কেটে যায়।

মা, তুমি কোথায়? কেন বাবা আমার এ বিয়ে দিলেন? তার চেয়ে কেন দু'খানা করে কেটে আমাকে নদীতে ভাসিয়ে দিলে না? এখন আমি কী করবো? এমন স্বামীর সঙ্গে ঘর করা আমার মতো মেয়ের পক্ষে অসম্ভব। তবে কি আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে? না, আমি তা' পারবো না। আর কেনই বা মরবো? তবে হ্যাঁ, এমন করে এখানে থাকলে আমি শুকিয়ে শেষ হয়ে যাবো! এখন আমার কী উপায় হবে? এ বিপদ থেকে কে আমায় রক্ষা করবে—বিয়ের পর ভাবনায়-ভাবনায় সরযূ শুকিয়ে গেল। তার চোখের কোণায় কালি পড়লো। মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

রাত্রে হঠাৎ এক সময় সদাশিব বললো, ওহো, আমাকে তো একবার বেরুতে হবে এখন—

আজ আবার কোথায় যাবে? খুব আস্তে সরযূ জিজ্ঞেস করলো।

বিশেষ দরকারে যেতে হবে, না গেলে মনোরমা না খেয়ে থাকবে।

মনোরমা কে?

জিব্ বের করে সদাশিব বললো, না, না, কেউ না। ইস্, তোমার সামনে আবার নাম করে ফেললাম—

বল কে? গম্ভীর স্বরে সরযূ জিজ্ঞেস করলো আবার।

কামড়াবে নাকি?

আজ তুমি কিছুতেই বেরোতে পারবে না।

এর মধ্যেই হুকুম করতে আরম্ভ ক'রেছ দেখছি, কিন্তু ফল হবে না, এ বড়ো শক্ত ঠাঁই—দরজা খুলে গট্ গট্ ক'রে সদাশিব বেরিয়ে গেল।

পরদিন সকালে লোকটাকে দেখে সরযূর ঘৃণা হ'লো। এই তার স্বামী। একটা মাতাল, দুশ্চরিত্র, অমানুষ! সদাশিবের একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সে।

কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

মনোরমার বাড়িতে, শুনলে? হ'লো তো এবার?

কে মনোরমা?

একটা মেয়েমানুষ।

চিৎকার ক'রে বললো, কেন তুমি আমাকে বিয়ে ক'রেছিলে?

চেঁচামেচি ক'রো না—এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। ফের্ অমন চেঁচালে গলা ধাক্কা দিয়ে বের ক'রে দেবো। বিয়ে আমি ক'রেছিলাম কেন সে কৈফিয়ৎ তোমাকে দেবো না—আমার খুশি তাই বিয়ে ক'রেছিলাম। একটা বাটপাড় গণৎকারের মেয়ের আবার তেজ!

দেখ, খবরদার বাবার নাম তুলো না বলছি।

আবার চেঁচাচ্ছ—চোখ রাঙিয়ে সরযূর দিকে তাকিয়ে সদাশিব বললো, না, বাবার নাম তুলবে না, কী আমার হাত দেখনেওয়ালারে—জোচ্চর!—

মুখ সামলে কথা ব'লো বলছি—ঝর্ঝর্ ক'রে সরযূর চোখ থেকে জল পড়তে লাগলো।

শুরু না হ'তেই সারা। হঠাৎ একদিন একা একা সরযূ আবার বাপের বাড়িতে ফিরে এলো। তারিণী শুয়েছিল। তাকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে ব'সে বললো, কী মা, কী খবর? খারাপ কিছু ঘটেনি তো?

সে কথার উত্তর না দিয়ে ভারী কান্নায় তারিণীর কোলের ওপর ভেঙে পড়লো সরযূ।

সরযূকে আবার এমন ক'রে ফিরে পেয়ে খুশি হ'লো তারিণী। সমস্ত ঘটনা মেয়ের মুখ থেকে শুনে তার নিজেকে মনে হ'লো অপরাধী।

আর তুই সেখানে ফিরে যাসনে মা, মাথা নিচু ক'রে তারিণী বললো। মেয়ের মুখের দিকে সে চাইতে পারছিল না।

না বাবা, আমি আর যাবো না, ফিরিয়ে নিতে এলেও না, দৃঢ় স্বরে সরযূ বললো।

হ্যাঁ, সেই ভালো, তুই আমার কাছেই থাক্ মা।

কিন্তু ওবাড়ি থেকে আর কেউ সরযূকে ডাকতে এলো না। প্রথম প্রথম সরযূর মনে ভয় ছিল, একটু আশাও ছিল যেন, হয়তো আসবে। দিন কেটে যেতে লাগলো। কেউ এলো না। সরযূ বরাবরের জন্যে এ বাড়িতে থেকে গেল।

সরযূর আকস্মিক প্রচণ্ড পরিবর্তন তারিণী লক্ষ্য করে। তার দিকে চেয়ে চেয়ে সে অবাক হয়ে যায়। মানুষের এত পরিবর্তন হয় কেমন ক'রে!

সরযূর চেহারা আধখানা হয়ে গেছে। আর তার হাসি শোনা যায় না —কথা বলে খুব কম। আর মনে হয় হঠাৎ তার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। মাঝে মাঝে চেহারা দেখলে বোঝা যায়, আড়ালে অনেকক্ষণ ধরে সে কেঁদেছে। আজ কাল বোধ হয় সে ভাল করে খায়ও না। এসব তারিণীর আরও অসহ্য মনে হয়। সমস্ত বাড়িতে যেন নিরানন্দের ছায়া স্ফীত হয়ে উঠেছে—চারপাশে একটা থমথমে ভাব—তারিণীর নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে।

একদিন আর থাকতে না পেরে তারিণী বললো, অমন গম্ভীর মুখে ঘুরে বেড়াস কেন মা?

কই, না তো বাবা।

তোর কি খুব মন খারাপ হয় রে? তাহলে বল না, আমি গিয়ে একবার সদাশিবের হাতে ধরে বলি—

না বাবা, অমন লোকের হাতে ধরতে তোমায় আমি দেব না, কিছুতেই আমি আর সেখানে ফিরে যাব না।

সেটা কি ভালো হবে মা?

হ্যাঁ বাবা, খুব ভালো হবে।

এরপর এ নিয়ে সরযূর সঙ্গে তার আর কোন কথা হয়নি।

শেষ অপরাহ্নের স্তিমিত গৈরিক আলো বাইরের পৃথিবীকে অপরূপ করে

তুলেছে। এরই মধ্যে তারিণীর ঘর অল্প অল্প অন্ধকারে ছেয়ে গেছে। সে হাত দেখছিল একজনের।

কিছু ভাবনা নেই, শুধু হোম করতে হবে, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন রায় মশাই, আমি সব ঠিক করে দেব—

ভক্তি ভরে গিয়ে তারিণীর পায়ের ধুলো নিয়ে ভদ্রলোক চলে গেল। তারিণী তক্তপোষ ছেড়ে উঠতে যাবে, এমন সময় কালো পেড়ে সাদা শাড়ি পরে আস্তে আস্তে সরযূ এসে তার সামনে দাঁড়ালো।

কী মা, কিছু বলবি?

তেমনি নিঃশব্দে সরযূ হাতটা তারিণীর সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বললো, আমার হাতটা একবার দেখ বাবা!

আনন্দে তারিণীর পা থেকে মাথা পর্যন্ত বিদ্যুৎ-শিহরণ খেলে গেল। এতদিন পরে সত্যিই সরযূর হার হয়েছে তার কাছে।

কিন্তু তারিণী একটি কথাও বলতে পারলো না।

তার চোখের জলে সরযূর হাতের প্রত্যেকটি রেখা অস্পষ্ট হয়ে গেছে।

শনিবার সকাল ঃ ১লা ভাদ্র ১৩৫২ ঃ কলিকাতা